দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুবি কখন আসবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১। কৃশানু, বেঁচে আছো?

আজ ২০ জুন। আজকের দিনটির যদি কোনও মানে থাকে, তবে তা কী জন্যে? আজ থেকে ৫৮ দিন আগে সত্যজিৎ রায় মারা গেছেন, তাই? নাকি, আজ থেকে ৫৭ দিন আগে, নন্দনের দিকে আগুয়ান শোকস্রোতের মধ্যে রুবি আমার হাত টেনে নিয়েছিল হাতে— সেইজন্যে? স্বীকার করতে অসুবিধে নেই, আমার ক্ষেত্রে পরেরটি। — আচ্ছা, যদি আমার মা মারা যেতেন ওই দিন, তাহলে, ২৩ এপ্রিল থেকে ৫৮ দিন পরে, এখনও তো, বলতে গেলে, আমার ন্যাড়ামাথাই। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, তাহলেও।

এর আগে দেখা হয়ে গিয়েছিল কর্পোরেশন অফিসের সামনে। যা ছিল অবশ্যম্ভাবী, অথচ যা নাও ঘটতে পারত, অন্তত এভাবে, শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল। রুবির সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল এবং একদম মুখোমুখি!

কখন, কবে, কীভাবে, কার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে— ঠিকই যে, সে ভাবনা মানুষের নয়। সে-সব ঠিক করে অন্য কেউ। অন্য কোনওখানে। তবু মানুষ তো ভেবে রাখে একটা কিছু। একটা লাঠি তো লাগে। তাছাড়া অন্ধ হাঁটবে কী করে। মায়, মৃত্যুর পরে কী, মানুষ তাকেও ধারণাতীত রাখেনি। স্বর্গ অথবা নরক, যার জন্যে যা, একটা কিছু ভেবে তো 'ছে। কেন জানি না, আমার ধারণা ছিল, হাসপাতালে বেডের ধারে দেখা হবে যখন খবর পেয়ে সে আসবে। একা? হ্যাঁ, রুবি একাই আসবে। একটু সিনেমা-সিনেমা? তা হোক। পুজোর উপন্যাস পড়ে আর সিরিয়াল দেখে দেখে সকলেই তো কমবেশি ভ্রংশবুদ্ধি, আমিই বা ব্যতিক্রম হব কী করে।

কর্পোরেশনের সামনে দু-এক মুহূর্ত শুধু। একরাশ পাতার ভেতর থেকে গোলাপি চোখ মেলে সে আমার দিকে তাকায়। ঝোপের মধ্যে থেকে যেন বুনো খরগোশ। চকিত গ্রীবা তুলে দেখল একবার।

তারপর পরমুহূর্তে, মিলিয়ে গেল ভিড়ে। কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায়? আমি অনুসরণ করিনি। করে লাভও হত না কিছু।

অভিজ্ঞতা থেকে জানি, চোখের পলকে ভিড়ে মিলিয়ে যাওয়ার জাদুবিদ্যা ওর জানা আছে। অতীতে এমন হয়েছে কতবার। অতীতে যখন সে ছিল শুধু আমার— একটু ঝগড়া হয়েছে কি আমার কোনও আচরণে ব্যথা পেয়েছে (আমি দায়ী হই বা না হই, হোক ভুল বুঝে, ব্যথা তো পেয়েছে), বা, রাস্তায় হঠাৎ দেখা কোনও বান্ধবীর সঙ্গে, হয়ত কথা বলে নিচ্ছি দুটো। রুবি অদূরে দাঁড়িয়ে এবং ক্ষণে ক্ষণে কড়া নজরও রাখছি। হঠাৎ দেখি নেই! টিভির বিজ্ঞাপনে সারিডন বড়ি খেয়ে প্রেমিকের কোলে মাথা বিছিয়ে দিতে দিতে কিটু গিদওয়ানি যেভাবে ঠেট বাংলায় বলে ওঠে (কপালে হাত বুলিয়ে)— 'ঢোলে গ্যাচে!' অবিকল সেই বৃত্তান্ত। ছিল; কিন্তু এখন নেই। হাওয়া হয়ে গেছে।

কারও সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে রাস্তায়, কথা বলা দূরে থাক, একটা নমস্কার পর্যন্ত করেনি কখনও। হাসাটাসার তো প্রশ্নই ওঠে না।

'আমি যতক্ষণ থাকব' পরিষ্কার বলে দিয়েছিল আমাকে, 'কারও সঙ্গে কথা বলবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বিশেষ করে কোনও মেয়ের সঙ্গে।'

'কী মুশকিল। দেখা হয়ে গেলে কী করব?'

'কিছু করবে না। চিনবে না।'

বলতে গিয়ে ফুলে উঠেছিল তার ঠোঁট দুটি। নিচেরটিই সমধিক। বলতে বলতে আমার দুই কাঁধের ওপর বিছিয়ে দিয়েছিল হাত। সে শরীর-ভাষায় স্বর্গের কুকুরী সরমার অবোধ উৎসর্গ ছিলই।

রেস্তোরাঁর কেবিন। চুমু খেতে হয়েছিল।

কর্পোরেশনের সামনে বিয়ের পর সেই প্রথম দেখা। যদি জানুয়ারির ৯১-তে বিয়ে হয়ে থাকে, তাহলে তখন সবে মাস দুই হয়েছে। দু-এক পলকের দেখা, খুঁটিনাটি কী আর দেখতে পাব। যেমন শাঁখাসিঁদুর। তবে তার দরকার ছিল না। বিবাহের উল্কি দগদগ করছিল সারা গায়ে। সিঁদুর ওর সর্বাঙ্গে ঝরে পড়ছিল। শাড়িতে, শরীরে লাল ভাবটাই ছিল আবহ। মূলত লালে এর আগে ওকে কখনও দেখিনি।

সেদিন বিকেলবেলা। এলিট ভেঙেছে। আমাকে দেখে সাহায্যের জন্য সে একবার, হায়, আকাশের দিকেও তাকায়। (পায়রা দানা খোঁটে মাটিতে। ঘাড় তুলে মাঝে-মাঝেই দেখে আকাশ। কেন যে। কলকাতার আকাশে তো আর একটাও বাজপাখি নেই।)

এবং, পরমুহূর্তেই— অদৃশ্য! একদম ভোজবাজির মতো। হাওয়া! পরে মনে হয়েছে, এই নিদারুণ ঠেলাঠেলি, নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা পরিধানের এই গিজগিজে ভিড়ে, রুবি বোধহয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল স্বামী-সান্নিধ্য থেকে। আর আশ্রয়ের জন্যে মরিয়া হয়ে খুঁজছিল সেই ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকেই। অবশ্য, বিনা নোটিসের ঝমঝম বৃষ্টি তখন সবে থেমেছে, এলিটও ভেঙেছে, ফলে যে সর্বপ্লাবী ভিড়— অদৃশ্য হওয়ার জন্যে সেদিন হয়ত তাকে ভোজবিদ্যার প্রয়োগ করতে হয়নি।

পরদিন সকাল থেকে না-পেরে, না-পেরে, শেষ পর্যন্ত অফিস ছুটির মিনিট পনেরো আগে ডায়াল করতে পারলাম। পেয়েও গেলাম এক চান্সে।

'শোনো। অনেকদিন পরে বিরক্ত করছি তোমাকে।'

নিস্তব্ধতা।

'তুমি কেমন আছ?'

নিস্তব্ধতা।

'কেমন আছ?'

'ভাল।'

'শোনো। একবার দেখা করতে পারবে?'

'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গলার স্বর পর্দায় ও ওজনে অবিকল একটু আগেই 'ভাল' বলার মতো অবিকল। স্বরক্ষেপণের দিক থেকে এত এক যে আমার প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরেও 'না' বললে কোনও লজিক থাকে না বলেই যেন বলেছিল 'ভাল'।

(ভাল আছি কি নেই তোমাকে আমি জানাতে চাই না। বা, আমি খুব ভাল আছি। আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু, তোমাকে তা জানাবার প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে।)

'আচ্ছা, ঠিক আছে।... তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে?

'হ্যাঁ।' সেই সাধা গলা!

'কনগ্র্যাচুলেশনস!'

নিস্তব্ধতা।

'আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা'।

ফোন আমি কাটলাম। নইলে ও যদি বলত 'আচ্ছা রাখছি', আর দু-এক মুহূর্ত দেখে? সেটা আমাকে মেরে ফেলা হত বললে যদি একটু বেশি বলা হয়, 'তা আমার কোমর ভেঙে দিত' বললে একটুও কম বলা হবে না। আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হত বাকি জীবন। 'আর কিছু বলবে?' এমন সুযোগ রুবি আমাকে কখনই দিত না। কেটে দিত, আমি জানি, 'রাখছি' ঠিক এই একটি কথা বলে। 'আচ্ছা রাখলাম' বা আমার মতো 'আচ্ছা রেখে দিচ্ছি' বলারও কোনও উপায় ছিল না তার। 'রেখে দিচ্ছি' বলতে গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও-র অসহায়তা ফুটে উঠতে পারত। গান গাইতে গিয়ে যেমন অনেক সময় হয়ে যায় না? দরবারিতে 'নিবিড় নিশীথ পূর্ণিমাসম' গাইতে গিয়ে দেবব্রতর গলায় ঘোর অমাবস্যা নেমে আসে না? সেইরকম। আবার, 'রাখলাম'— বললে 'দুম' করে একটা শব্দ হতে পারত মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার। 'রাখছি'-র মতো অত নৈর্ব্যক্তিক হতে পারত কি? কিছুতেই না। পূর্বরচিত চিত্রনাট্যের গভীর নিরাপত্তার বাইরে সে এক পা বাড়াত না। একটা বাড়তি নিঃশ্বাসই ফেলেনি, তো, একটা বেশি কথা।

ভাল। না। হ্যাঁ। আচ্ছা।

দুম। দুম। দুম। দুম।

চারটি বুলেট। অভ্রান্ত লক্ষ্য। কী সুচিন্তিত সংলাপ! কী অমোঘ স্বরনিয়ন্ত্রণ! শ্রেষ্ঠদের শেখা উচিত।

ডেলিভারির সময় একখানা নিঃশ্বাসও কি বেশি পড়তে নেই?

ভাগ্যিস, ফোন আমি আগে কেটে দিয়েছিলাম। ওকে সুযোগ দিইনি! নাকি, ও-ই সে সুযোগ আমাগে দিয়েছিল? আমার পৃথিবী যাতে ভেঙে না পড়ে। (যা ভাঙে, নট উইথ আ স্টার্ট। বাট উইথ আ হুইস্পার।)

শান্তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আরও আগে। এম-১১ বাসে। শান্তা স্কুল যাচ্ছে। দূরের সিটে রুবি। একা? হ্যাঁ একা। বাড়ি ফিরে বলল, 'আচ্ছা, রুবির কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী ব্যাপার?'

'আজ বাসে দেখা।'

আমি দাড়ি কাটছিলাম। আয়নায় নিজের চোখের দিকে না তাকিয়ে বললাম, 'তা আমি কী করে জানব কার কবে বিয়ে হচ্ছে?'

সকালবেলা। লীলা ঘর মুছবে। প্লাস্টিকের বালতিতে বোতল থেকে ফিনাইল ঢেলে দিচ্ছে শান্তা।

'চুলটুল সব কেটে ফেলেছে। হঠাৎ চিনতে পারিনি।' শান্তা বলল, 'শাঁখা তো কেউ পরে না আজকাল। সিঁদুর থাকলেও লুকনো। তবে খুব ঝলমলে দেখাচ্ছিল। আর কসমেটিক্স-এর যা বাহার। তাই দেখে বুঝলাম। হাত ভর্তি সোনার চুড়ি।'

'কথা বললে?' আমি চোখে জল-ঝাপ্টা দিই।

'না, দূরে বসেছিল। হাসল। তার পর স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। লীলা, আর একটু শুকনো করে মোছ। আর পাখাটা চালিয়ে দাও।... কালীঘাটে নেমে গেল।'

শুচিস্মিতার সঙ্গে বইমেলায় দেখা। আজকাল প্যাভিলিয়নের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় পোড়ামাটির গয়না বিক্রি করছে। নেকলেস, বালা, ইয়ার-রিং— এ-সব তো বটেই, মায়, নাকছাবিও রয়েছে। নতুন জিনিস। মেয়েদের খুব ভিড়। 'দাঁড়াও, বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই' বলে কোত্থেকে একটা ঢ্যাঙা তির্খুটে যাকে ডেকে আনল, দেখলাম, সে সেই মানুষের ভাষা না-জানা দেবদূত কৃশানু নয়। কৃশানু কথা প্রায় বলত না বলেই হয়ত শুচি চুপ করে থাকত। আমাদের কথা শুনে দিনো-দিন ব্যান্ডেল চার্চ ঘুরে এসে শুচি হেসে বলল, 'বাকিটা ওর কাছে শোনো।' কৃশানু শুধু বলল, 'ঠিকই আছে।' দেখলাম, ও একদম পাল্টে গেছে। শুচিস্মিতা। চুলটুল কাটেনি রুবির মতো। কিন্তু, একটা নতুন জিব লাগিয়েছে। লাফিং গ্যাসের জ্বালায় অনর্গল হাসছে আর কথা বলে যাচ্ছে। প্লাক-করা ভ্রূ ক্ষণে ক্ষণে উঠে যাচ্ছে কপালে। কটাক্ষ না করে আজ আর বাপের সঙ্গেও কথা বলে থাকে না, মনে হল।

সল্টলেকে বাড়ি ওদের। গাড়িশালে গাড়ি। বাবা কলকাতার নামকরা গাইনি। একমাত্র সন্তান আজ পথের ধুলোয় রাজস্থানি বানজারাদের ঘাঘরা পরে বাউন্ডুলে বরের সঙ্গে কেমন সব হারিয়ে সানন্দা! বরের নাম বলল রণবীর। গাঁজার গন্ধে ভুরভুর করছে জায়গাটা।

'কবে বিয়ে করলে?'

'মনে নেই তো!' বরকে ঠ্যালা দিয়ে বলল, 'হ্যাঁগা, কবে গা। অ-নেক দিন হয়ে গেছে, না?' বলে বরের বদলে আমাকে রক্তিম কটাক্ষ করল। ভুল বুঝে হাসতে থাকে কুলকুল করে।

বলল, 'রুবিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল মেট্রো রেলে। দু'পাশে দু'জনের কোনটা ওর বর, বুঝতে পারলাম না। যদি বাঁদিকেরটা হয়, আরেব্বাস, ইয়াগ-গোঁপ। ডাইনেরটা তো হতেই পারে না— টেকো। বাপের বয়সী। অবশ্য হতে পারে যে, দাঁড়িয়েছিল এমন কেউ। মোট কথা আলাপ করিয়ে দিল না। হয়ত ছিলই না সঙ্গে।' বলে শুচি ঠোঁট ওল্টায়, 'রানী-কালার জরিপাড় শাড়িতে যা দেখাচ্ছিল না রুবিদিকে। একদম হার ম্যাজেস্টি!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিক-প্রেমিকা হিসেবে ও আর কৃশানু ছিল আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আর্ট কলেজে সবে ফোর্থ ইয়ার। কলকাতায় কিছুটা আড়াল আছে এমন প্রেমময় জায়গা আর ক'টি। তাই মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে দেখা হয়ে যেত।

একদিন আমিই অফার করলাম। মনে হল, একটু পাকিয়ে দিই ওদের ব্যাপারটা। বয়স বাড়িয়ে দিই। বললাম, 'কাল এস না তোমরা আমাদের ফ্ল্যাটে। তিন দিন খালি।'

'তুমি থাকবে?'

'না।'

'বৌদি থাকবেন না?'

'না। বৌদি এ-ক'দিন মেয়ের সঙ্গে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন।'

কৃশানু নড়েচড়ে বসল। কাশল একবার।

শুচি মুখ একটু ঘুরিয়ে রেখে বলল, 'কখন?'

'দুপুরবেলা? দুটো নাগাদ?'

'তুমি থাকবে না?'

রুবি আর হাসি চাপতে পারে না। হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যাঁ-রে বাবা, থাকব। আমরাও থাকছি। আমরা থাকব বলেই তো। তোমরা পাশের ঘরে থাকবে।'

'যদি বৌদি এসে পড়েন?'

এবার আমি হাঃ-হাঃ করে হাসতে থাকি।

সত্যি এই সব ধুকপুক না থাকলে রোমান্স। আমাদের মতো সিজনড্ পাঁচ বছুরে তো নয়। সবে শুরু।

'তোমরা এস। আমরা থাকব।' আমি অভয় দিয়ে শুচিস্মিতাকে বলি, 'জানো তো, টু মাচ অফ কোর্টশিপ স্পয়েলস দ্য লাভ?'

সারা দুপুরে, মাঝে একটু ঘুম মেরে নিয়ে, আমরা দু'বার সঙ্গম করলাম। দু'বারই করতে হয় আমাদের। কেন না, দ্বিতীয়বারের আগে রুবির কাঁপুনি আসে না। কোমর অসাড় হয় না। এটা বহু-পরীক্ষিত। রুবির যৌনতার এটা একটা পরম কৌতূহলোদ্দীপক দিক, আমার কাছে। কৌতুকময়ও বলতে পারি। এক কথায় বলতে গেলে, পরম রমণীয়ই বলা উচিত, 'রমণী' শব্দটি যদি বাচ্যার্থে ধরি। অন্যত্র, সর্বত্র প্রেম। কিন্তু, ফ্ল্যাট-প্রবেশের পর দরজায় ছিটকিনি তোলার পরমুহূর্ত থেকে তার ভূমিকা যেত কী পাতিনাটকীয়ভাবে বদলে!

এখানে একটা প্রাসঙ্গিক গল্প বলে নিই? নইলে, পরে আবার মনে থাকবে না! সেই যখন বিয়ের আগে আমি শিয়ালদহর কাছে নুর মহম্মদ লেনে একা থাকতাম। রোজ রাত ১১টা নাগাদ দৃশ্যটি অভিনীত হতে দেখা যেত। বন্ধুবান্ধবদের ভিড় জমে যেত সেই অনির্বচনীয় নাইট শো-তে।... রাস্তার ওপারে আমাদের দোতলার ছাদ থেকে কিছুটা উঁচুতে চারতলার ফ্ল্যাটে একটি নবাগত মাড়োয়ারি-পরিবার। নতুন বউ পাশের ঘরে সেই দশটা থেকে শ্বশুর-শাশুড়ি আর ননদ-দেওরদের সঙ্গে গল্প করছে তো করছেই। আর তার বরের অন্ধকার সিলুয়েট, এ ঘরের জানালায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, এই যে রতিবিমুখ বধূ যে নাকি রমণকক্ষের ছিটকিনি পর্যন্ত বন্ধ করত কত না আলস্যভরে— নীল আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার পরমুহূর্তে সে শাড়ি ও ব্লাউজ খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে দিত সে কী ঝপাঝপ দ্রুততায়! তারপর শায়া ও ব্রেসিয়ার পরে জানালার নিচে ডুব মারত। বলাবাহুল্য, ও-দুটি সে স্বামীকে দিয়ে খোলানোই মনে করত শ্রেয়। (উল্লেখ থাকে যে, ব্যবসা ও রতিক্রিয়া উভয় ক্ষেত্রেই মাড়োয়ারি সম্প্রদায় পুরু ও মোটা গদি ব্যবহার করে থাকে, যা পাতা হয় মেঝের ওপর।)

ফ্ল্যাটটি উঁচুতে বলে এ-ছাড়া কিন্তু দেখা যেত না কিছুই। দড়িতে টাঙানো শাড়ি ও ব্লাউজের ওই উড়ন্ত দৃশ্য ছাড়া। আর এই দৃশ্য দেখতে প্রতি রাত্রে সাহিত্যযশপ্রার্থী বন্ধুদের ভিড় জমে যেত আমার ঘরে। শচীন, প্রবাল... এরা তো আসতই। নাম করে লজ্জা দিতে চাই না। আজকের পুজো সংখ্যার খেপ-মারা কবি-সাহিত্যিকরা অনেকেই এসেছে। কারণ একটাই। সারারাত শুধু পাখার হাওয়ায় শাড়ি উড়বে আর ব্লাউজ উড়বে— বাকিটা ভিস্যুয়ালাইজ করতে হবে যার-যত কল্পনাশক্তির জোরে— পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লিটারারি ওয়ার্কশপ ছাড়া একে আর কী বলব। অন্তত, কল্পনাশক্তির উদ্বোধনের দিক থেকে। অর্কপ্রভ তো প্রবন্ধ লিখত। এই দৃশ্য লেংচে দেখতে দেখতেই একদিন তালগাছ হয়ে উঠল তার স্নায়ুসমূহ। এখন তো র‍্যাঁবোসমান বিখ্যাত কবি। মোট কথা, জানালার কুঁজো থেকে পতিব্রতার জলপান করার আগে পর্যন্ত সবাই রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করত। কেউ নড়ত না।

বাইবেলকে ঠেস দিয়ে রুবি শুচিস্মিতার কাছে জানতে চাইল, 'কী সাপটাপ এসেছিল? কিছু বলল?'

শুচি তখন কিছু বলেনি। পরে আমাকে বলেছিল, 'দ্যাখো বিল্বদা, আমরা কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। একটু চুমু পর্যন্ত নয়। শুধু হাতে-হাত ধরে বসেছিলাম। ও একটিও কথা বলেনি।' বইমেলায় শুচিস্মিতা আমাকে জানাল, 'আমি কিন্তু তোমার কথা একবারও তুলিনি। যদি রুবিদির বর আশপাশের কেউ হয়? তবে, রণবীরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। রুবিদিও কৃশানুর কথা জানতে চায়নি।'

এতক্ষণে আমাকে দ্বিতীয় কটাক্ষ করার কথা মনে পড়ে শুচির, 'একটু গাঁজা চলবে, বিল্বদা?'

একটা গাঁজা-ভরা সিগারেটে পরপর চারটে পাফ মেরে ও ধোঁয়া না ছেড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

আমার হঠাৎ জানতে ইচ্ছা করল, হ্যাঁগা মেয়ে, তোমার কৃশানু বেঁচে আছে তো?

২। 'সরোজিনী চলে গেল অতদূর?'

আজকের ২০ জুন দিনটির ওপর কিন্তু আর-একটি স্মরণীয়তার দাবি আছে। মশা ও/অথবা মাছির মতো এটাও আমাকে নিয়ত জ্বালাচ্ছে। আজ থেকে সতের দিন পরে আমাকে এবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুজো-উপন্যাস জমা দিতে হবে। ৭ জুলাই ম্যাজিনো লাইন। তার আর পর নেই। এপার-ওপার নেই। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত বাজারের ফর্দ পাওয়া গেলেও, সম্পাদকের দূত এসে আমাকে জানিয়ে গেছে, তারপরে আর গৃহীত হবে না।

আমি লেখাটি এখনও শুরু করিনি। আজ বিকেলে কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিলাম। প্রকাশকের ওখানে। আমার শেষ বই 'আমি ঘনশ্যাম নই'-এর এঁরা প্রকাশক। জানতে না চাইলেও এঁরা মুখে অন্তত একবার স্বীকার করেছিলেন, বইটি ভাল বিক্রি হয়েছে। অবশ্য সেখানেও একটা ইতি-গজ ছিল। বলেছিলেন, 'বইমেলায়'। আর, ভাল বলতে? 'ভাল' তো একটা বিমূর্ত বিশেষণ। কত? যেন দিবসের শেষ সূর্য প্রশ্ন করছে, 'কে তুমি'? — মেলেনি উত্তর। (বা, মেয়েদের বয়স যেন। জিজ্ঞেস করতে আছে? ছিঃ। 'আরে পুরুষ!'... বলে জামাইবাবু কুবেরকে কত না গঞ্জনা দিয়েছে কপিলা।)

'বাবু, কিছু দ্যান' বলে চাইতে হবে। হাত কচলে। তা হলে কিছু পাওয়া যায় তথা যেতে পারে। তবে তা হিসেবের কড়ি নয়। তা একাধারে বাবুর অনুগ্রহ। ('জমিদারের সামনে যেমন ভাগচাষী'— একটি এমত শ্রেণীসচেতনতার এখানে প্রয়োজন হবে কি?)

মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়, বছরও কাবার। না হিসেব, না-কিছু। (অথচ কী গালভরা নাম তার, অহো। কী? না, রয়ালটি। রাজদক্ষিণা!) আর, সংস্করণ? সে তো ফুরোবে না কোনওদিনই। আজকাল ফোটো-অফসেটের যুগ না? এ নয় যে আগের মতো গেলি ভেঙে ফেলা হয়েছে। আবার কম্পোজ করতে হবে। এখন একবার কম্পোজ করে প্রুফট্রুফ দেখে ফোটো খিঁচে নিলেই হল। দু' হাজার শেষ? আর হাজার দুই ছেপে নাও। শুধু কাগজ আর প্রিন্টিং। প্রথম সংস্করণই চলছে, চলবে। ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া!

প্রকাশক নেই। পুরী গেছেন। রথ থেকে ফিরতে দিন পনের। শনিবারের বিকেল। কিছু টাকা পেলে খানিকটা নেশা করে ফেরা যেত। হয় ছোটা ব্রিস্টল নতুবা ডেকার্স লেনের ঠেকে প্রবাল আজ থাকবেই।

কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেলেও ভেতরে দু'জন প্রুফরিডার, একজন পিওন ও একটি টেলিফোন রয়েছে। আজ সেকেন্ড স্যাটারডে। রুবি এখনও থাকতে পারে ওখানে। ওকে একটা ফোন? 'তুমি বেঁচে থাকতে পারবে?' 'কতদিন?', 'যতদিন না মরতে বলি?' ভবানীপুর রোড সেমেটারির অগণন ওবেলিস্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত ধরে রুবি আমাকে কথা দিয়ে গেছে, 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। তুমি অপেক্ষা করবে।' তারপর জলে-পাওয়া মাছ হেন, কোথায় কী করে যে মায়াবিনী মিলিয়ে গেল ভিড়ে! তারপর দেখতে দেখতে ৫৭ দিন হয়ে গেল। এর মধ্যে দেখা যে হয়নি আর কখনও, তা বলতে পারব না। একদিন দুপুরবেলা, আগে যেমন আসত, ভেতর থেকে বন্ধ দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল, দেখি চৌকাঠের ওদিকে রুবি দাঁড়িয়ে। মুখটা বুকের দিকে নামানো। সে অবশ্য মাঝরাতে, স্বপ্নে। আর একদিন এল-নাইনের দোতলার কাচে। তখন সন্ধেবেলা। কাচে বৃষ্টির ছাট। বাস তখন হু-হু করে সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল পার হচ্ছে। আমি স্পষ্ট জানতে চাইলাম, 'কী গো, কবে আসবে তুমি?' 'আসব।' 'আর কতদিন?' তারপর আর দেখা গেল না। তারপর শুধু বৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলতে পারেন এ-সব কি কোনও দেখা। ফাজলামি? পলকহীন চোখে উত্তরে তাঁকে বলা যায়, আচ্ছা, পাষাণ মূর্তির সামনে আমরা কি প্রার্থনা করি না? করি তো। কেন করি? আমি আবার জানতে চাইছি, কেন? নিশ্চয়ই পাথরও শুনতে পায় বলে। তাই নয় কি? এই সব আসা-যাওয়া রুবির, এও সেইরকম। একে না বিশ্বাস করার কিছু নেই।

প্রকাশকের ওখান থেকে আমি শচীনকে ফোন করলাম। বাড়িতে ছিল। বেশ মেজাজে ছিল ব্যাটা। আগাগোড়া হাসতে হাসতে কথা বলল। পুজোর উপন্যাস, বলল, এবার মাত্র একটা লিখছে। ভাবছে, সামনের বছর থেকে আর লিখবে না। অনেক তো হল। আর কী হবে। মানে-মানে বিদায় নেওয়াই ভাল। আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো ভাই বুড়ো বয়সের বিয়ে (শেষের দিকে আবার লিখছি)। কম হলেও, ছেলেপুলে সব এখনও নাবালক। প্রবাল কী বলে জানো? বলে, প্রথম বইদুটো লিখে ওখানেই চেপে গেলে আমি নাকি দা মোস্ট সিগনিফিকেন্ট সাইলেন্স ইন বেঙ্গলি লিটারেচার নামে সাহিত্যের ইতিহাসে একটা পুরো চ্যাপ্টার পেতাম!'

'হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ...।' শচীন হাসতে লাগল।

'অত কম লিখলে হয়, তুমি বল! অথচ সমর সেনের ব্যাপারটা দ্যাখো। কতটুকু লিখেছেন। আজ তো নক্ষত্র!'

'পদ্যে অমন হয়। প্রতিভা থাকলেই হয়। গদ্যে গা-গতর খাটাতে হয়। প্রোচুর', শচীন জোর দিয়ে জানাল, 'পরিশ্রম করতে হয়।'

'পরিশ্রম?' আমিও হাসতে লাগলাম, 'সে তো জরুরি অবস্থার সময় হোর্ডিং লাগাত— কঠিন পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নাই?'

'আরও একটা পোস্টার ছিল' শচীন হাসতে থাকে, 'টিকিটলেস ট্রাভেলার্স— বিওয়্যার। হেভি পেনাল্টি অ্যাওয়েটস ইউ। মনে আছে? হা-হাঃ-হাঃ।'

'পোস্টার নয়। ওগুলো লেখা থাকত বাসের গেটে।' আমি মনে করিয়ে দিই, 'ডান দিকে ইংলিশ। বাঁদিকে বাংলা।'

'বাংলাটা পদ্যে থাকত না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' মনে পড়ে যাওয়ার খেলায় আমিও মেতে উঠি। 'প্রবহমান পয়ারে। বিনা টিকিটের যাত্রীরা সাবধান। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তিবিধান।'

'ছন্দের ভুল।'

'তা হোক। মিল রয়েছে। ট্রান্সপোর্টে তখন কৃষ্ণকান্তি মোদক। নিজে ছড়া কেটে নোট লিখল, মাস্ট বি পেন্টেড অন বোথ সাইডস অফ অল স্টেট বাস ডোর্স। যাতে কোনও ব্যাটা চোর না মিস করে। বিশ্বাস করো, আমার সামনে। আমাকে দেখাল।'

'কিন্তু প্রমোশন পেল অ্যানিমেল হাজবেন্ড্রিতে!'

এবার হো-হো করে হাসতে থাকি আমরা দু'জনেই। 'সে তো', হাসতে হাসতে কথা আটকে যায় আমার, 'সে তো, বামফ্রন্ট ফিরে-আসার পর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন কিস্তিতে শচীনের ৯০ পাতা জমা দেওয়া হয়ে গেছে। আর এক কিস্তি বাকি। শচীন বলল, ৭ তারিখের আগেই হয়ে যাবে। শচীন বিখ্যাত লেখক। প্রফেশনাল। ওর কথা আলাদা। আমি আন্ডারডগ। আমাকে পুরো মাল দিতে হবে একসঙ্গে। এবং ৭ তারিখেই। ৮ হলে ফোটো। আমি ঝুলিয়ে দিতে পারি। শচীন পারে না। সে পেশাদার।

লেখক দুই প্রকারের। এক, যার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স থাকে। দুই, যার থাকে না। এক, যার বইয়ের সংস্করণ হয়। দুই, যার বইয়ের সংস্করণ হয়

এক, যে পুরস্কার পায়। দুই, যে পুরস্কার পায় না।

আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর।

শচীন আজকাল বড় বড় ক্যানভাস ধরে। ৩০×২০। দেশ, জাতি, সময়, ইতিহাস এর কমে কিছু সে আজকাল ছোঁয় না বললেই চলে। অত বড় সব ক্যানভাস এক-একটা, পুজো সংখ্যায় জায়গা কোথায়? কোনও কাগজে এ-দিকটা, কোথাও ও-দিকটা ভর্তি করে। তারপর, শেষেরটিতে গ্যাপগুলো দেয় ভরিয়ে। ওর 'এই দেশ তোমার আমার' নামে এপিক-উপন্যাসটি যে-ভাবে বেরুল। তিন বছর ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাঁচ-পাঁচটি উপন্যাস একত্রে।

তাতেও হচ্ছে না। যাই হোক, আরও ছিল, এদিক-সেদিক। যখন বই বেরুল, দেখা গেল, হাজার পাতা ছাড়িয়ে গেছে। তার কমে এপিক হবেই বা কী করে। দুই খণ্ডে যখন বই বেরুল, দেখা গেল, আগের উপন্যাসগুলির নাম মুছে গেছে। আরও দেখা গেল বিভিন্ন অংশের চরিত্ররা আলাদা এবং কেউ কাউকে চেনে না। না চিনুক, তবু একটা বিষয়ে মিল রয়েছে। আর তা হল, এরা সবাই ক্যানিং তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার লোক। অন্তত, সমালোচকরা এই যোগসূত্র লক্ষ্য করলেন। আসলে উপন্যাস মাত্রেরই স্বাস্থ্যবতী হওয়া দরকার। নইলে এপিক-এপিক লাগে না। আকাদেমি-জ্ঞানপীঠ তো দূরস্থান, বঙ্কিম পুরস্কারেও পাত্রস্থ হয় না। 'দেশ হামারা' শিরোনামে বইটি হিন্দি সিরিয়ালে এল গত বছর জুড়ে। প্রাইম টাইমে। যাই হোক, টু-থার্ড মাল ও ইতোমধ্যেই নামিয়ে দিয়েছে জেনে আমি বেশ দমে গেলাম।

'তোমার তো ভাই হৃষীকেশ-হরিদ্বার এ-সব আগে থেকেই থাকে। শুধু একটা লছমনঝুলা লাগিয়ে দেওয়া।' আমি ওকে বলি। 'লছমনঝুলা, অ্যাঁ, লছমনঝুলা!' মনে হল হর-কি-পৌড়ির প্রদীপ-ভাসা সন্ধ্যায় গঙ্গার মতো ওদিকে দুলে উঠল শচীন, 'লছমনঝুলা! বাঃ, বেশ বলেছ।'

'এবারের লোকেশন কী? ক্যানিং?'

'না-না, দূর! ও-সব ক্যানিং-ফ্যানিং ফিনিশ হয়ে গেছে!'

'তা হলে কি ময়নাগুড়ির ওদিকটা। ওদিকেও তো তুমি দু'মাস মাস্টারি করেছিলে— তাই না?'

'নর্থ বেঙ্গল নিয়ে ঢের লিখেছি। ওদিকটা আমি পরমেশ ভৌমিককে ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন ওদিকে আর গ্যাপ-ট্যাপ নেই? কত লোকজন ওদিকে। কত গরিব মানুষ!'

প্রবাল হলে আমাকে এতক্ষণে কমপক্ষে দু'বার 'বাঞ্চোৎ' বলত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শচীন ভাল মানুষ। রুচিসম্মত মানুষ। শুধু লেখায় নয়, আচার-আচরণেও ও পুরোপুরি প্রফেশনাল। প্রপার। ক্যানিংয়ে মাস্টারি করতে করতে নেহাতই চাঁদ কপালে বলে, একটা গ্রান্ট পেয়ে, ছ'মাস বিদেশে এক সাহিত্য-কারখানায় (ওয়ার্কশপ) কাজ শিখে এল। এসেই কাজ ছেড়ে দিল। সাহিত্যকে গ্রহণ করল একমাত্র জীবিকা হিসেবে। ক'জন পারে? আমরা কেউ পেরেছি! পাঠভবনে ওর ছোট ছেলে ফার্স্ট হয়। আমাদের হয়? বড় ছেলে ডাক্তারিতে ঢুকেছে। হোক বর্ধমান। জয়েন্টে তো নাম উঠেছিল। কলকাতায় ফ্ল্যাট, গাড়ি, এ-সব কেনা শেষ। এখন রাইরে কোথায় কী, দেখছে। ছবির মতো, সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতো ওর জীবন। উত্তর ছিল শূন্য। এক চান্সে মিলিয়েছে।

তবে 'বাঞ্চোৎ' বলতে কেমন সে এখনও জানে না। বললও না। হার্ডকোর প্রফেশনাল বলে সে জানে, আমি কেন এ-সব বলছি। কীসের জ্বালা থেকে। আমি কেন লিখতে পারছি না। আর সে কেন পারছে। আমি আন্ডারডগ বলেই না? ('কুকুরে ঘেউ ঘেউ করবে, কিন্তু ক্যারাভান চলে যাবে।' প্রাচীন হিব্রু প্রবাদ।)

কথা বদলে শচীন বলল, 'প্রবালেরও তো একই অবস্থা।'

কে বলে ভাসমান ব্যক্তিরও বুদ্ধি থাকে? আর যাই করুক, সে তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে না? প্রবাদটি হোক্স। আমার আমর্ম মনে হল, প্রবালই আমার বন্ধু। আমার এই মুহূর্তে ওকে দরকার। যে পারছে না, যারা পারে না, এটা কি হতে পারে না যে তারাই লেখক? এ আমি কার সঙ্গে কথা বলছি এতক্ষণ। আমার দরকার প্রবালকে।

আমি সাগ্রহে জানতে চাইলাম, 'কী-রকম কী-রকম'।

শচীন বলল, 'প্রবাল তো এসেছিল।'

'কোথায়?'

'বাড়িতে।'

'কী বলল?'

'ওই ওদিকে।' বোধহয় হাই তুলল শচীন।

'কী বলল?'

'তুমি যা বলছ। এবার লিখতে পারছে না।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, শচীন নয়। আমার দরকার ছিল প্রবালকে। যে পারছে না। কিন্তু ওকে কি ছোটা ব্রিস্টল বা ডেকার্স লেনে পাব?

'ঠিক আছে শচীন। অনেকক্ষণ আড্ডা হল।' আমি বললাম, 'যদিও টেলিফোনে।'

'টেলিফোনে কি আড্ডা হয়? মঙ্গলবার এস না তুমি। আমি একুশ শতাব্দীতে থাকব।' অর্থাৎ ওর প্রখ্যাত প্রকাশকের ওখানে। যারা আমার মতো অ্যামেচারের বই ছাপে না। ছাপবে না কোনওদিন। হোক মিথ্যে, যারা বাৎসরিক বিবৃতি দেয়।

'তুমি যদি আস তা হলে আসব।' বললাম বটে, মনে মনে ঠিক করে রাখলাম মঙ্গলবার আমি আসছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কেন লিখতে পারছি না, তা আমার অজানা নয়। আমার কল্পনাশক্তি নেই। লেখক হিসেবে এদিক থেকে আমি খুঁতো। তাই, আমি লিখতে পারি শুধু সেইটুকু নিয়ে যা আমার জীবনে ঘটেছে। তৃতীয় চক্ষু বিনা যা দেখা যায়, তার বেশি আমি দেখতে পাই না। এদিকে আমার জীবন খুব ঘটনাবহুল নয় বলে, লিখতে লিখতে, জীবনের ঘটনার দিক থেকে আমি নিঃস্ব হয়ে পড়েছি। এখন আমার জীবনে কিছু ঘটা দরকার। রুবির সঙ্গে দেখা হলে যেটা ঘটবে। আমি ওর সঙ্গে ডায়মন্ড হারবার যাব। পাহাড়ি রাস্তার খাদের কিনার দিয়ে যেভাবে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে যায়— আমার মাথা উঁচু, আমার আশ নেই, পাশ নেই, আমার শুধু সামনে। মঙ্গলবার দিনটা আমি পুরো ইউজ করব। ৭ জুলাইয়ের মধ্যে যদি পাতা-পঞ্চাশও হয়... কিস্তি ওদের নিতেই হবে। আমার কাছেও। আমার সঙ্গে ওরাও কিছুটা ঝুলে আছে। তৃণখণ্ড হলেও... না ভাবার্থে একেবারে হোক্স নয় প্রবাদটি।

আমি শুনেছি, সুবোধ ঘোষ নাকি একবার সন্ধ্যাবেলায় ধরে পরদিন ভোররাতের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ পূজা-উপন্যাস নামিয়ে দিয়েছিলেন। ওঁর চারটি করে স্লিপ হচ্ছে আর তা প্রেসে চলে যাচ্ছে, এভাবে। আর্টিস্টকে শুরুর আগেই গল্প বলে দিয়েছিলেন এবং সে ফ্রন্টপিস ও ছবিটবি যা আঁকার এঁকে দিয়ে বাড়ি চলে গেছে। ছবি ব্লকমেকারের কাছে চলে গেছে ও সেখানে কাজ শুরু হয়ে গেছে। (তখনও ফোটো অফসেট যুগ আসেনি যে ছবিগুলি পাতায় সেঁটে দিলেই হবে।)

তখন পুজো-সংখ্যা বেরত মহালয়ার আগের দিন। আর সেবার মহালয়া ছিল উনি যেদিন ভোরে শেষ কপি দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন (কোম্পানির গাড়িতে) তার থেকে তিন দিন দূরে। যথাদিনে ভোরের হকাররা পত্রিকাটি পেয়েছিল। এবং সেবার সুবোধবাবুর উপন্যাসটি হয়েছিল বিগ হিট। এ-যেন হুবহু সেই 'রাত পোহাল, ফর্সা হল, ফুটল কত ফুল'-এর মতো ব্যাপার। তাই না?

সুবোধ ঘোষের কথা যখন উঠল, এখানে তাঁর অরচিত একটি গল্পের কথা বলে নিই? শুনতে হয়ত মন্দ লাগবে না। বলাবাহুল্য, এটি গল্প নয়।

পারিস তো পেরে যা *

স্থান হাজারিবাগ। হাজারিবাগ রোড থেকে একটি ভোরের বাস ছাড়বে। কন্ডাক্টর সুবোধ ঘোষ। (উনি লেখালেখির আগে ওদিকে কন্ডাক্টরি করতেন।)

শীতকাল। লোকজন কমই উঠেছে।

প্রতিদিন প্রথম বাস ছাড়ার আগে এক পাগল বৃদ্ধ (বোধহয় বাঙালি বলে) কন্ডাক্টরের কাছে চার আনা পয়সা পায়। তার সারাদিন এতেই চলে। রোজদিনের মতো সে হাত পেতে দাঁড়িয়ে।

সেদিন কন্ডাক্টর সাহেবের মেজাজ খারাপ। খুচরো মেলেনি। মালিকের সঙ্গে বচসা হয়েছে। হুইসিল বাজিয়ে সুবোধবাবু পা-দানিতে।

নামকরণ আমার— লেখক*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগল: কী রে, কী হল?

সুবোধবাবু: কী আবার হবে?

পাগল: পয়সা দিবি না?

সুবোধবাবু: না।

পাগল: কেন। পারবি না?

'পারি।' দ্বিতীয় হুইসিল বাজিয়ে সুবোধবাবু বললেন, 'কিন্তু দেব না।'

পাগল হতভম্ব। এমনটা কখনও ঘটেনি।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে দেখল সে। তারপর হঠাৎ একগাল হেসে সুবোধবাবুকে ওই কথা বলে। অর্থাৎ, 'পারিস তো পেরে যা'।

কেউ কেউ এখানে আপত্তি তুলে বলতে পারেন, পুজোর লেখালেখি নিয়ে বেশ তো ইয়ার্কি হচ্ছিল। সুবোধ ঘোষ এল কোত্থেকে। সম্পর্ক কী।

সম্পর্ক নেই? আমি তো, এই গল্পের সঙ্গে আমার বর্তমান অবস্থার যথেষ্ট মিল খুঁজে পাচ্ছি (অন্তত এই মুহূর্তে)। ছেঁড়া কাঁথাকম্বল গায়ে জড়িয়ে পাগল বলছে, 'পারিস তো পেরে যা।' একজন ভাবী লেখককে। উৎসাহই দিচ্ছে!

চোখে পিচুটি। মুখে তার হো-চি-মিন দাড়ি। তার পিছনে সুবোধ ঘোষ-আমলের পাহাড়, বনানী আর লাল রাস্তা...

এ-সব কত সুলভে পাওয়া যেত তখন! যখন পাগলে উৎসাহ দিত। কত সহজ ছিল লেখালেখি! বিন্দুমাত্র গিনেস-মনস্কতা ছাড়াই, এক রাতে একটা উপন্যাস?

'সরোজিনী চলে গেল অতদূর?

সিঁড়ি ছাড়া–

পাখিদের মতো, পাখা বিনা?'

ভাবা যায়!

৩। হাউজহোল্ড গ্লাভস ও কিচেন নাইফ

অফিস থেকে মাসখানেক ছুটি নিয়েছি লিখব বলে। লেখালেখি একবর্ণও হয়নি। লেখার ছুটির গোড়াতেই মেয়ে এগিয়ে এল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে এ-বারের উপন্যাস নিয়ে।

বলল, 'বাবা, কুষ্ঠ কি হতে পারে না?'

মাঝে মাঝে হঠাৎ বুকের মাঝখানটায় এমন হয় না, যেন কেউ পাশ ফিরে শুল? (কোনও দুঃসংবাদের ঘোষণা সহসা শুনলে।)

আমি বললাম, 'বলিস কী রে!'

দেখলাম তার বুড়ো আঙুলের মাথাটা বেশ হেজেপচে গেছে। ছাল উঠে গেছে আঙুলের। নখ পড়ে গেছে। তার আঙুলের গাঁটে ব্যথা, ঝুনু জানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আঙুল থেকেই তো শুরু হয়, না বাবা?'

আঙুল থেকে? তা হতে পারে। আমার ঠিক জানা নেই। কুষ্ঠ সম্পর্কে আমি শুধু এইটুকু জানি যে, 'দেবতা ও মানুষ ছাড়া আর কারও কুষ্ঠ হয় না।' প্রাণী জগতে কুষ্ঠ নেই। এই রোগ নাকি দেবতাদের অবদান। কুষ্ঠের উৎস তাই দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়। কুষ্ঠ কীভাবে আর কোথা থেকে শুরু হয়, তা তো জানি না! মনে পড়ে, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে নামের আকর্ষণীয়তায় মুগ্ধ হয়ে 'দ্য কার্স দ্যাট কেম ফ্রম হেভেন' বইটি র‍্যাক থেকে নামিয়ে, একবার খুলে দেখে, বইটি যথাস্থানে রেখে টয়লেটে চলে গিয়েছিলাম হাত ধুতে। ভূমিকায় লাল পেন্সিলে দাগানো ছিল কথাগুলি। কিন্তু তার বেশি কিছু তো জানি না।

'হলে কুষ্ঠাশ্রমে থাকবে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসব।' শান্তা নিয়তি-মার্কা নিঃস্পৃহ গলায় ওকে বলল। নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে?

কিন্তু আমি রীতিমতন চিন্তিত হয়ে পড়ি। আঙুলের গাঁটেও ব্যথা-ট্যথা বলছে এবং এত চিকিৎসায় একটু সারল না— ব্যাপারটা কী?

'হোক আগে। ডাক্তার দেখুক।' শান্তা বলল।

'কী হোক আগে।' আমার গলায় চাপা গর্জন।

শান্তা বলল, 'আজকাল তো সেরে যায়। লেপ্রসি সংক্রামক নয়। প্রায়ই তো টিভিতে দেখায়।'

শান্তার নিষ্কাম ভাবগতিক আমার কুষ্ঠের চেয়ে সংক্রামক লাগে। গীতা-ফীতা পড়ছে নাকি?

দুপুরে খেতে বসেছি একসঙ্গে। আমি আর-একটু মাছের ঝোল চাইলাম। ঝুনু বলল, 'তুমি আমার থেকে নিতে পার।'

এমনিতে এ-রকম ক্ষেত্রে সোজা ঢেলে দেয় পাতে। বরাবর তাই করেছে। আজ দিল না। একটু আগেই ও আঙুল দিয়ে ঝোলটা নাড়িয়েছে, আমি দেখেছি। 'কুষ্ঠ সংক্রামক নয়' টিভি বলে থাকে ঠিকই। তবে তার আগে 'সব' বলে এক সংখ্যাবাচক বিশেষণ থাকে। অধিক আর কী বলব। এ-সব কথা বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

আমার নিজের একটা গল্প আছে, ছিল, যা সরাসরি বলছি। সেই যেবার কলেজে-পড়তে প্রথম একা ঘাটশিলা গিয়েছিলাম। উঠেছিলাম ফুলডুংরিতে। একদিন মৌ-ভাণ্ডারের হাট থেকে ফিরছি। রাস্তা দিয়ে ফিরলে মাইল-দুই। ধানকাটা মাঠের আল ধরে আমি শর্টকাটে ফিরছিলাম। মাঝামাঝি এসে সঙ্গী সাঁওতালরা বুরুডির পথ ধরল। আমি একেবারে একা পড়ে গেলাম। দেখলাম, বিকেল শেষ হয়ে আসছে। দিক ঠিক রেখে আমি জোরে হাঁটা দিলাম। বুঝলাম, এ সেই মাঠ, যা ফুরোবার আগেই অন্ধকার নেমে আসে। আজ চাঁদ উঠেছে মোটে একফালি।

খানিকটা এগিয়ে দেখি, কিছু দূরে একটা টিলার ওপর দিয়ে পাঁচ-ছ'জন লোক ছাড়াছাড়া ভাবে হাঁটছে। সূর্যাস্তের মিয়নো আলোয় তাদের খুব শ্রান্ত দেখাচ্ছিল। কীরকম ঝুঁকে আর টাল সামলে আদি গুহামানুষের মতো হাঁটছিল তারা! বেশ অনেকক্ষণ লাগল তাদের টিলার ওদিকে নেমে যেতে। সাঁওতাল মনে হল। এ-দিকে সাঁওতাল পাড়া? যদি থাকে, তার ভেতর দিয়ে হেঁটে নিশ্চয়ই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপালপুরের রাস্তায় ওঠা যাবে। যদিও ততক্ষণে অন্ধকার। দোকানপাট কি জনমানব নেই ওদিকেও। তা হোক। তবু, রাস্তা তো একটা।

টিলায় উঠে নিচে সত্যিই একটা সাঁওতালপল্লী দেখতে পেলাম। আমার তাড়া ছিল। মুসাবনির দিকের পাহাড়গুলোর পিছনে সূর্য নেমে গেল বলে। পাহাড়ের ছায়া পড়ে এদিকে বড় চট করে অন্ধকার হয়ে যায়। ঢাল বেয়ে আমি তরতর করে বস্তিতে ঢুকে পড়লাম। ঢুকেই কেমন খটকা লাগল। দু'ধারে সারবন্দী কুটির, মাঝখান দিয়ে সরু রাস্তা এঁকেবেঁকে, তকতকে রোয়াক, অবিকল সাঁওতালপল্লী— অথচ, রাস্তা সম্পূর্ণ জনহীন, কেউ বাইরে নেই, ঘরে শব্দ নেই, ছেলেপিলের চেঁচামেচি নেই; ঠিক এই সময় দেখা যায় একপাল গরু নিয়ে ধুলো উড়িয়ে কেউ না-কেউ ফিরছেই। এতক্ষণে একটা মুরগিরও কি রাস্তা পারাপার করার কথা নয়, উড়ে অথবা দৌড়ে? দূরের কোনও কুটিরের দরজা দিয়ে যদিও-বা কেউ আমাকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়ে নিচ্ছে মুখ। (যেন বিবরবাসী।) এই সময় আমি লক্ষ্য করলাম, কুটিরগুলো যেন একটু নিচু-নিচু ঝোপড়ি ধরনের। নিজের অজান্তে আমার গতি শ্লথ হয়ে এল। যাই হোক, আরও খানিক এগিয়ে, প্রায় শেষাশেষি পৌঁছে, পথের বাঁক ঘুরতেই এক সাঁওতাল রমণীর প্রায় মুখোমুখি আমি হয়ে যাই। না, ঠিক মুখোমুখি নয়, কিছুটা দূর থেকেই সে দেখে থাকবে আমাকে। সময় ছিল। সেও সরে যেতে পারত। তবে, অন্তত ৬০ দশকের শাস্ত্রবিরোধিতা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত, ঘাটশিলার সাঁওতাল মেয়েদের পক্ষে এটাই তো ছিল স্বাভাবিক। পুরুষ মানুষ, হোক না দিকু, এগিয়ে এলে তারা কিন্তু পালিয়ে যেত না। এখন তো বুকে জামা মায় ব্রেসিয়ার (মাইনস-এর মেয়ে হলে), ফিরেও তাকায় না।

মেয়েটি আমাকে তার দিকে অগ্রসর হতে দিল। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। দেখলাম, সে এক অপূর্ব সুন্দরী মানবী। তবে অন্তত তার চোখ দুটি ছিল অমানবিক। তার চোখের পিঙ্গল তারা দুটি ছিল কিছুটা লম্বাটে, কিংবা আমার দেখার ভুল। কিন্তু তাতে একটা বন্য ক্রুদ্ধতা ছিলই। (যা ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের মতো দেখা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল।) চোখের চাওয়ায় ছিল তাকে ছুঁয়ে দেখার অগাধ আহ্বান। নিজের বধ্যভূমিতে উপনীত হওয়ার বোধ আমার মনে জাগে।

বিস্তৃত দুই হাতে খোলা পাল্লা ধরে সমর্পণকামী ক্রুশকাঠের মতো সে দাঁড়িয়ে। দু'দিকে কুটির-শ্রেণী, মাঝখান দিয়ে সরু পথ, পথ প্রাণীহীন। এক অলীক সান্ধ্য কারফিউ-এর মধ্যে কে আমাদের এভাবে মুখোমুখি করে দিল?

তার কপালে মেটে সিঁদুরের মস্ত টিপ। চুল তৈলস্নাত। শাড়ির লাল পাড় নাভির ঈষৎ নিচেই। আজ সে খোঁপা বাঁধেনি।

আমি নম্র গলায় বললাম, 'এই তোদের গাঁ দেখতে এলাম আর কি?'

'ভালো করল্যেক বাব্বু!'

বলে সে চওড়া করে হাসল। ঠিক কেমন ছিল তার গলার স্বর, কী জাদু ছিল সেই ঠেঁট বাংলায় ছোটখাটো বাক্যটিতে— কীভাবে বোঝাব তা জানি না। কল্পনাশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান লেখকরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কত সহজে একটা উপমা বা ইমেজ দিয়ে দিতেন এমন ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, আমারও মনে পড়েছে, যা আমি বলতে চাই। বড় 'ভাল' ছিল সেই নারীকণ্ঠ। একটা না-একটা রাগরাগিণীর ছোঁয়া তাতে ছিলই, যা আজও আমার কানে লেগে আছে। আমি এইমাত্র আবার শুনতে পেলাম। কিছুই একে বাধা দিতে পারল না। বিগত তিরিশ বছরের জলরাশি একটি লেজের ঝাপটায় মুহূর্তে পার হয়ে এসে জলের তলায় ভাঙা জাহাজের মধ্যে একা-হাঙরের মতো সেই সুর, এই তো, এখনও কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ওই ভাষা! কী মর্মছোঁয়া, ওহো। আমি তাদের গাঁয়ে এসে কী— না, ভা-ল করেছি।

'ভালো করল্যেক বাব্‌বু!'

মানুষের ভাষা কি এ, নাকি, সেই ভাষাজননী, সকল ভাষা যার সন্তান। পরে পড়েছিলাম—

কান্তারের পথ ছেড়ে
সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে
বলিল, তোমারে চাই।
কড়ির মতন সাদা মুখ তার
দুইখানা হাত তার হিম
চোখে তার
হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে...

গোটা ব্যাপারটা সে-রকম কিনা, তা জানি না।

তো, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম। হ্যাঁ! সেই যে 'বাবু' বলে ডাকল, তারপর থেকে রমণীর আধখোলা ঠোঁটে সেই শরীর-সৌন্দর্য স্পন্দনহীন দাঁড়িয়ে। (শুধু তার ঠোঁটের ভিতরদিকে জিভটি একবার গোলাকারে বুলিয়ে নিয়েছিল।) বুঝলাম এই ক্রুশকাঠ এখন একটি যিশু চায়। (এই চুম্বকক্ষেত্র চায় একটি আলপিন?)

আমার শরীর তার দিকে বেঁকে গেছে, এমন সময় সেই প্রথম তার চোখ থেকে চোখ ছিঁড়ে এবার ভাল করে আমি তার মুখ দেখলাম। তার বুক দেখলাম। শ্রোণি, নিতম্ব, সাদা শাড়ির পাড়ের লালের সঙ্গে তার পায়ের পাতায় নেমে এসে আমি প্রস্তরীভূত হয়ে যাই। আমি তার হাতের মুঠির দিকে তাকাই।

বুঝলাম সবই। আমি একটা কুষ্ঠরোগীদের বস্তিতে এসেছি।

গল্পটা শুনে উড স্ট্রিটের এক পার্টিতে মদের গ্লাস হাতে অ্যালেন গিনসবার্গ আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'ডিড ইউ কিস হার?'

'কিস? ও নো।' আমি তাকে বলি, আমার হাতেও মদের গ্লাস, 'আই কেম আউট অফ দ্যাট হেল-হোল উইথ ব্যাকওয়ার্ড স্টেপস, ইউ নো। আই ওয়াজ ইন আ ট্রমা– শর্ট অফ– ইউ সি?' বলতে চেয়েছিলাম, তখন তো আমার রক্তে ছানা কেটে গিয়েছিল অ্যালেনদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বাট ডিডিন্ট শি স্ল্যাপ ইউ?' মাতালের উজ্জ্বল হাসি হেসে জানতে চেয়েছিল অ্যালেন।

আমরা যেদিন অ্যালেনকে নিয়ে প্রথম সোনাগাছি যাই, ও কনডোম ব্যবহার করেনি। ওর মতে, আমাদের আত্মার খুব সিফিলিস। অ্যান্ড অল উই নিড ইজ আ ভাস্ট কনডোম টু প্রোটেক্ট দা হেলথ অফ আওয়ার সোল। তরুণ ফ্লাবেয়ার নাকি বেশ্যাবাড়িতে যেত চুরোট খেতে খেতে এবং জ্বলন্ত চুরোট মুখে নির্নিরোধ সঙ্গম করতে তাকে বহুবার দেখা গেছে। অ্যালেন বলেছিল।

মেয়ের কথা শুনে বুকের মধ্যে যে পাশ ফিরে শুল, সেই মনে করিয়ে দিল। হ্যাঁ, স্মৃতির চেয়েও পরাক্রান্ত আছে কিছু। আর তা হল বিস্মৃতি।

অ্যালেনকে যা বলেছিলাম, যতটুকু বলেছিলাম, আজ তিরিশ বছর ধরে তাই ছিল সত্য হয়ে। কোনও দিন সন্দেহ হয়নি।

মেয়ের কথা শুনে বিস্মৃতির গহ্বর থেকে আজ তিরিশ বছর পরে খিলখিল হেসে উঠে এল স্মৃতি-বিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি সেই নীল সাপ, যা উল্কি হয়ে আঁকা ছিল সাঁওতাল রমণীটির খোলা বুকে, যুগান্ত পেরিয়ে আমার মনে পড়ল— তার প্রখর স্তনবৃন্তের দিকে সাপটি বাড়িয়ে দিয়েছিল তার হাঁ-করা মুখ। বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়ে উঠোনে প্রায়ান্ধ আকাশের নিচে আমি তার বুক খুলেছিলাম। তার স্তনের-দিকে-সাপ দেখেই আমি প্রথম কেঁপে উঠি। তারপর হাত-পা দেখি। তারপর পিছোতে থাকি।

এবং এ-হেন বিশ্বাসঘাতকতার পর স্মৃতির ওপর আমি এ আস্থা রাখি কী করে যে, বুকে-সাপ দেখে পিছিয়ে আসার আগে আমি তার ঠোঁটে অন্তত একটি চুম্বন করিনি।

সেই থেকে শুরু? কুষ্ঠ কি এক প্রজন্ম বাদ দিয়ে আসতে পারে?

ঘাটশিলার অন্ধকার আকাশে সেদিনের ক্ষীণ শশাঙ্ক এতদিনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নাম বলেছিল, রেবেকা সোরেন।

চোখ চশমার ওপর তুলে ডাঃ সলিল পাঁজা ঝুনুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খুব কুটনো-টুটনো কোটো? ফলটল কাটো?

ঝুনু বলল, 'হ্যাঁ।'

'বঁটিতে?'

মেয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'ছুরিতে কাটবে। আর কিছুদিন জল-টল ঘাঁটবে না, কেমন?' আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এর বুড়ো আঙুলে একটা লোকাল ট্রমা হয়েছে। বঁটির কাটাকুটি থেকে। একে একটা কিচেন-নাইফ কিনে দিন। আর একজোড়া হাউসহোল্ড গ্লাভস। আমি কোনও ওষুধ দিচ্ছি না।'

উনি ফিজ নিলেন না। এবার পুজোয় কোথায় লিখছি, জানতে চাইলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪। ইতিকথার আগের কথা

৬০ দশকের গোড়ার দিকে উপন্যাসের সংখ্যা নিয়ে পুজোসংখ্যাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একেবারে শুরুতে পুজোসংখ্যায় একটি উপন্যাস থাকত। ৬০-এর দশক থেকে প্রথমে দুই, পরে সংখ্যাটি তিনে দাঁড়াল। এবং সেভাবেই ক'বছর থাকল। তারপর হঠাৎ পুজোসংখ্যাগুলো সাত-আট এমনকি দশটি করে উপন্যাস ছাপতে শুরু করল। এ ব্যাপারে শারদীয় দিগম্বরীর ১৪ উপন্যাসই অদ্যাবধি রেকর্ড হয়ে আছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, যে তার মধ্যে ঘটনাচক্রে, একটি উপন্যাস থাকার কথা ছিল আমার। কিন্তু, আমি পারিনি দিতে। আই কুড নট ডেলিভার দা গুডস্। এ-সব ১৯৮১ সালের কথা।

হয়েছিল কী, সেবার দিগম্বরীতে আমার লেখা গল্পটি কিছুটা বড় হয়ে যায়। খুব যে বড়, তা নয়। 'খাও হে চক্রবর্তী' পর্যন্ত লিখতে (অগ্রদানী) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মল পাইকায় ১৮ পাতা লেগেছিল। যাক সে কথা। সে-সব বুড়ো-হাবড়ার কথা। এখন দিনকাল তো স্লিম ফিগার ফিল্ম ফেসের।

কম্পোজ করে আমার গল্পটি দেখা গেল ১৪ পৃষ্ঠা হয়েছে। তখন সম্পাদক আমাকে লিখলেন,

শ্রী বিল্বমঙ্গল চক্রবর্তী,
স্নেহাস্পদেষু,

তোমার গল্পটি খাসা হয়েছে। তবে গল্প তিন পৃষ্ঠার বেশি হোক, এটা আমরা চাই না। এবার ৩০টি গল্প যাবে। এদিকে, তোমার গল্পটি আর মাত্র ৫-৬ পৃষ্ঠা বাড়িয়ে দিলে (আরও ৪০০০ শব্দ) এটি উপন্যাসের আকার পেয়ে যায়। এক পৃষ্ঠা ফ্রন্ট পিস এবং কিছু বেশি ইলাস্ট্রেশন দিলে বিজ্ঞাপন-সহ এটাই পাতা পঁচিশে দাঁড়িয়ে যাবে। আশা করি, তুমি কষ্ট স্বীকার করে এটুকু সহযোগিতা করবে এবং দু-একদিনের মধ্যেই বাকি অংশ পেয়ে যাব। এ বছর উপন্যাসের জন্যে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে।

প্রীতি শুভেচ্ছান্তে,
দীনুদা। (দীনবন্ধু পাঁজা।)

আসানসোল থেকে একটি লিটল ম্যাগাজিন মাঝে মাঝে বেরোয়। নাম: চন্দ্রবিন্দু। ওখানে স্থানীয় বি বি কলেজের প্রৌঢ় অধ্যাপক শিশিরবিন্দু চেল-এর একটি গবেষণাধর্মী দীর্ঘ রচনা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। সেখান থেকেই জানলাম, শাঃ দিগম্বরীর ওই ১৪ উপন্যাসই সর্বকালীন রেকর্ড। অধ্যাপক চেল বছরকাবারি হিসেব যা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, ১৯৮১ সালে ছোট-বড় মাঝারি সব কাগজ মিলিয়ে ১৮৭টি পুজো-উপন্যাস বের করে যার মধ্যে বিভিন্ন শারদীয়াতে একা শচীন সর্বাধিকারী লিখেছিলেন ১১টি। বলা বাহুল্য, এ দুটিও অল টাইম রেকর্ড।

শচীন সর্বাধিকারীর মাত্র একটি উপন্যাস ('আমি গয়ারাম') থেকে ন্যূনতম সম্ভাব্য উপার্জনের যে সংক্ষিপ্ত হিসেব অধ্যাপক চেল দিয়েছেন, তা রীতিমত রোমহর্ষক। তথ্যাদি সংগ্রহ করে উনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে লিখেছেন: (ক) ছাপা হল দু'বছর ধরে সাপ্তাহিক পত্রিকায়। ১০৪ সপ্তাহ। প্রতি কিস্তি ১০০০ টাকা মাত্র। ১০৪X১০০০= ১,০৪,০০০ টাকা। (খ) বই বেরুল দুই খণ্ডে। দাম প্রতি খণ্ড ১০০ টাকা মাত্র। প্রথম সংস্করণ দুই খণ্ডে খণ্ডপ্রতি ২২০০ হিসেবে ৪৪০০ কপি ছাপা হয়। ৪৪০০x২০০= ৮,৮০,০০০ টাকা। প্রথম সংস্করণের ১৫ পার্সেন্ট রয়ালটি নামকরা প্রকাশক অগ্রিম দিয়েছিল: ১,৩২,০০০ টাকা। (গ) বই ৩২ হিন্দি সিরিয়াল টিভি-তে প্রদর্শিত। গল্প ও সিনারিওর জন্য সিরিয়াল প্রতি মাত্র ৪০০০ করে পান। ৪০০০x৩২= ১,২৮,০০০ টাকা। ক, খ ও গ যোগ করে ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।

এখানে পাদটীকায় অধ্যাপক চেল মন্তব্য করেন, 'আলোচ্য বই বেস্ট সেলার হওয়ার দরুন পঞ্চদশ সংস্করণে পড়েছে এবং বাংলা-হিন্দি ডাবল ভার্সানের জন্য চলচ্চিত্র-চুক্তি সম্প্রতি নিষ্পন্ন হয়েছে। বলা বাহুল্য, শেষের হিসেব দুটি আমার ফর্দভুক্ত নয়। — লেখক।'

আমি মনে করি, অধ্যাপক চেলের হিসেবে ভুলচুক আছে। আর, একটু বেশিই হবে। যেমন, ওই বই-এর জন্য ২৫,০০০ টাকা আকাদেমি পুরস্কার এ হিসেবের বাইরে। স্বীকার করি, তা শচীনের নখের ময়লা। তবু। অবশ্য, শচীনের ১৫০টি বই-এর প্রত্যেকটিকেই তো এমন রত্নপ্রসবিনী বলা যায় না।

শচীন লেখালিখি শুরু করে আমার অনেক পরে। দিগম্বরীর দিগন্তে গদাহস্তে তার আবির্ভাবের আগে— আমিই ছিলাম দীনুদার রেসের ঘোড়া। গোড়ায় বিদেশের সাহিত্য-কারখানায় (ওয়ার্কশপ) ছ'মাসের ট্রেনিং নিয়ে এসে শারদীয় দিগম্বরীতে সে লিখল তার প্রথম উপন্যাস সোনার পিত্তলমূর্তি। ব্যস, এক তোপে উড়ে গেল যাবতীয় 'বাঙালি লেখক', বা এই শেষের শব্দ দুটির আদ্যক্ষরায়ন করলে যা হয়— পরিণত হল এক-একটি 'বা-লে'-তে।

বিষয়টা যতটা প্রাঞ্জল মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা তাই। আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে শোক-আহ্লাদ-সর্বনাশসহ সবই তো সহজ-সরল। স্মিতমনে গ্রহণ করার জিনিস।

তাই না? যদি সেভাবে দেখি। তবে ওই, টোকা দিলেই মুশকিল। জীবন শিশুর হাতে ক্যালাইডোস্কোপ যেন। অমনি একটা অননুমেয় নতুন ছক দেখা দেবে। এভাবে একটার পর একটা অফুরান দেখা দিতে থাকবে। অবশ্য, টোকা দিয়ে যেতে হবে। তবেই।

এক্ষেত্রে প্রথম টোকায় যে দৃশ্য ভেসে উঠবে তা ইন্দ্রপ্রস্থের দ্যূতসভার। ভাঞ্জে শচীন সর্বাধিকারী উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছে, 'লেকিন হামারা দান দীনু-মামানে ফেকেগা!' দীনুমামা বলতে দীনবন্ধু পাঁজা। (শকুনি)। ভাগিনেয়র (ভাঞ্জের) হয়ে তিনি পাশার ঘুঁটি ছুঁড়ে দিচ্ছেন, ছকের ওপর গড়াতে গড়াতে যা বারবার বাজির অব্যর্থ সংখ্যাটি হয়ে দেখা দিচ্ছে। দিগম্বরীতে একের পর এক উপন্যাস লিখে বাজির পর বাজি মাত করছে শচীন। টোকার পর টোকায় দৃশ্য বলতে এই একটাই ('লেকিন হামারা দান...')— শুধু প্যাটার্ন বদল। তারপর ১৯৮১ শাঃ দিগম্বরীতে সভায় এলেন একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদী স্বয়ং। শচীন সর্বাধিকারীর অলটাইম বেস্ট সেলার: আমি গয়ারাম।

আর একটা টোকা। ওই দেখুন, দীনবন্ধু আমার পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'তোমাকে তো যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলাম ভাই। বাট ইউ কুড নট ডেলিভার দা গুডস। হিজড়ে-নায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গয়ারামের কনসেপ্ট তুমি ভাবতে পারনি। দ্যাট ওয়াজ বিয়ন্ড ইউ। আহা, বাছা, তোমাকেই বা দোষ দিই কেন। একি পৃথিবীতে কেউ পেরেছে? শ্যে মি ওয়ান পিস অফ একজাম্পল? বঙ্গসরস্বতীর বস্ত্রহরণ তথা তাঁকে তার চাপড়ানো ঊরুতে বসাবার অধিকার আমি তাই আজ থেকে', ডান হাত প্রসারিত করে, 'শচীন সর্বাধিকারীর হাতেই তুলে দিলাম।'

ওই দেখুন, দ্যূতসভা থেকে বা-লে বিল্ব বেরিয়ে যাচ্ছে। হেঁট-মুণ্ডে ও ঊর্ধ্বপদে।

৫। কাজেম মিঞা

গত পঁচিশ বছর ধরে আমি লিখছি। প্রতি বছর পুজোতেই যে পেরেছি লিখতে এমন নয়। (সুযোগও পাওয়া চাই।) তবে গত পাঁচ বছরে আমার চাহিদা বেড়েছে। (কেন জানা নেই।) বিভিন্ন পুজো-সংখ্যায় আমি পাঁচটি উপন্যাস লিখেছি। গত পাঁচ বছরে।

কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করেন, এবারের লেখা নিয়ে নিশ্চয়ই চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছেন? সত্যি কথা বলে দেখেছি, কেউ বিশ্বাস করে না। বলেছি, আমি তো আগে থেকে ভাবি না কিছুই। মাস-দেড়েক আগে একটা কলম কিনে আনি। একটা প্যাড। তারপর লিখতে শুরু করি। লিখতে লিখতে লেখাটা হতে থাকে। প্যাড ফুরিয়ে যায়। এবং কলমটি আমি আমাদের ফ্ল্যাটের ওয়েস্টবিনে ফেলে দিই। (দামি কলম কিনি না।) বিষয় নয়, প্লট নয়— মনোমতন কলম পাই না কোনওবারেই, যাতে টানা ১০০ পাতার মতো লেখা যায়। সমস্যা আমার একটাই। সমস্যা একটা শান-দেওয়া চপারের। ছাল-ছাড়ানো মাংস, সে তো হুক থেকে সামনেই ঝুলছে। আমার জীবন। সি আই টি মার্কেটের কাজেম মিঞার সঙ্গে লেখক হিসেবে আমার একটুও গরমিল নেই। অন্তত অ্যাপ্রোচের দিক থেকে।

তবে, এই প্রথম আমি এক অভূতপূর্ব ঝামেলায় পড়েছি। চপার হাতে আমার বেঁচে-থাকার কাছে গিয়ে দেখেছি, আমার সর্বস্বতার আজ কিছু আর পড়ে নেই। রাং, গর্দান, সিনা, পসিনা— কোথাও মাংস লেগে নেই ছিটে-ফোঁটা। বছরের পর বছর ধরে কেটে দিতে দিতে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন সব বিক্রি হয়ে গেছে। ওই অস্থিগুলি ছাড়া, সর্বস্বতার, কিছু আর পড়ে নেই।

একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। মেয়ে এনেছিল। চলে গেছে। সেই সঙ্গে চলে গেছে আমার এবারের পুজো-উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ থিম।

কেউ কেউ বলতে পারেন, মেয়ের কিছু হয়নি, সে তো ভালই হয়েছে। হয়েছে, কল্পনা করে লেখ না। এটাই তো সেরা সমাধান। তোমার মেয়ে বাঁচল, উপন্যাসও হয়ে গেল। দুই কুলই রক্ষা পেল।

না!

ও-সব সিনেমায় হয়। ডে ফর নাইট। রাত্রের দৃশ্য আমি দিনে শ্যুট করতে পারি না। দিনকে পারি না রাত বানাতে। মেয়ের কুষ্ঠ হলে, তবেই আমি পারি মেয়ের কুষ্ঠ নিয়ে লিখতে। (জানি, মা-পাঠিকারা এখানে বলছেন, দূর মুখপোড়া, তোর কুষ্ঠ হোক। তুই পচে-গলে মর। তোর মেয়ের হতে যাবে কেন? অমন লেখার ক্যাঁতায় আগুন।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা, যদি আমার কিছু হয়, তাই হোক। কিন্তু, একটা কিছু ঘটা দরকার। এইসব হাবিজাবি লিখতে লিখতে। নইলে এবার আর পুজোর লেখা হবে না।

৬। তিন বাড়ুজ্যে

তিন থেকে চোদ্দর মধ্যে গোটা ৬০/৭০ দশক জুড়ে ওঠা-নামা নামা-ওঠা করতে করতে ৮০-র মাঝামাঝি থেকে পুজো-সংখ্যায় উপন্যাসের সংখ্যা ছ'য়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক বছর আর বাড়া-কমা নেই। অর্থনীতির ভাষায় অবস্থাটিকে স্থিতিশীল বলা যেতে পারে।

'দিগম্বরী'র পুজো সংখ্যায় এখন ছ'জন এক্সক্লুসিভ ঔপন্যাসিক দরকার। এ-বছর আমি 'দিগম্বরী'র টিমে নামছি। দীর্ঘ সতের বছর পরে দীনুদার আমাকে মনে পড়েছে।

স্পষ্টই বললেন, ওই আকাদেমি পাওয়ার পর থেকে শচীনের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। আজকাল দেশ, সময়, ইতিহাস এই সব ধরেছে। গোরা-ফোরা লিখে রবীন্দ্রনাথ হতে চাইছে। বাড়িতে নাকি ছবিও আঁকছে লুকিয়ে। এদিকে মার্কেট-রিসার্চ বলছে, নিউ জেনারেশনে ওর কোনও কদর নেই। তারা চায় এই সময়ের কথা। তারা চায় মডার্ন রায়িটিং। আমি আসছি এই স্লটে। আমাকে লিখে দেখিয়ে দিতে হবে যে শচীন কিছু নয়। দা কিং ইজ ওল্ড। অ্যান্ড নেকেড।

এবার থেকে দিগম্বরী ২১ হাজার টাকা দেবে। রাতারাতি রেট ডবল করার কৃতিত্ব একা শচীনের। শচীনকে ডেকে দীনুদা এবার যা জানতে চেয়েছিলেন, তার মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়: আচ্ছা, শচীন, এই যে সব আমাদের ঔপন্যাসিকরা সমস্ত পুজো সংখ্যায় বারোভাতারি করে বেড়াচ্ছে, বারোভাতারি করে বেড়াচ্ছে, (ইম্পর্টান্ট, কথাগুলোয় দ্বৈততা-দান ওঁর মুদ্রাদোষ) কত পেলে, তোমার মনে হয়, এরা আমার রাঁঢ় হয়ে থাকবে? শচীন ভেবেচিন্তে বলেছিল, একুশ। অবশ্য শচীন এতে ফেঁসেই গেছে। সেও আর কোথাও লিখতে পারবে না।

বোধহয় তো আমাকে বাজিয়ে দেখার জন্যেই একদিন দীনুদা জানতে চাইলেন, 'তোমার কী মত?'

'কোন ব্যাপারে দীনুদা?'

'এই আর কোথাও না লিখতে পারার ব্যাপারটা।'

'দেখুন, এটা তো আমার পক্ষে প্রযোজ্য হচ্ছে না?' আমি এড়িয়ে যেতে চাই, 'আমি তো বরাবর একটাই লিখি। একটার বেশি আমি পারি না লিখতে।'

কিন্তু কমলি ছাড়বার পাত্রী নয়। দীনুদা বললেন, যেন কিছুই নয় এমনভাবে, আর হাই তুলে, 'না-না। লেখকের স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠেছে তো। তাই বলছি।' আমার কেন যেন মনে হল এটা একটা ইনকুইজিশান। আমার উত্তর মালিককে জানানো হবে। উত্তরের জন্যে, যদিও ক্যাজুয়ালি, চুপ করে আছেন দীনুদা। বুকের মধ্যে থেকে শুধু অ্যাজমার সাঁই-সাঁই শব্দ ভেসে আসছে।

একটু ভেবে নেওয়ার জন্যে আমি একটা সিগারেট ধরাই। না, আমিও বানের জলে ভেসে আসিনি। আমিও লিখছি পঁচিশ বছর ধরে। ওই ২১ হাজার টাকা আমার চাই। লেট স্টার্টার হলেও, ফ্ল্যাট কেনার দিন আমার এখনও চলে যায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, 'না-না, এ তো ভাল কথাই। লেখার স্ট্যান্ডার্ড ভাল হবে।'

'কিন্তু কেউ যদি, ধরো, বছরে দুটো ভাল উপন্যাস লিখতে পারে। পারে তো? প্রাইমটাইমে এমন তো প্রায় সবাই লিখেছেন। মানিকবাবুর দিবারাত্রির কাব্য আর পদ্মানদীর মাঝি তো একই বছরে— তাই না?

আমি জানি না। দীনুদা যখন বলছেন, হয়ত নয়। তবে এটা জানি, পেটের দায়ে, বছরে তিনটে উপন্যাসও তাঁকে লিখতে হয়েছে। এবং তিনটেই শ্রেষ্ঠ। তবু, আমি ফাঁদে পা দিই না। চুপ করে থাকি।

আমার নিজের কাছে প্রশ্ন একটাই। আর ক'টা দিন। দিবারাত্র জেগে আমি কি পারব লিখতে? কিছু কি ঘটবে এর মধ্যে, ওই ২১ হাজার আমি কি ঘরে তুলতে পারব কমবেশি তিরিশ হাজার শব্দের বিনিময়ে? শব্দ পিছু ৭০ পয়সা। ভাবা যায়?

সত্যি, আমি কি একজন লেখক? ছিঃ! মাঝে মাঝে ঘেন্না ধরে যায় নিজের ওপর। যদি লেখক হতাম, আমার কল্পনাশক্তি থাকত। বানিয়ে লিখতে পারতাম আমি। প্রতিভা থাকলে যেটা পারা যায়। না, শ্লেষ করে বলছি না। লেখকের কল্পনাশক্তি থাকে বৈকি। থাকে প্রতিভা। মৃত্যুর কিছুদিন আগে মানিকবাবুর সঙ্গে আমার একবার কথা হয়েছিল বরানগরে। ওঁর গোপাললাল ঠাকুর রোডের বৈঠকখানায়। (সেটাই লেখার ঘর।) তখন আমি ছাত্র।

'আচ্ছা মাঝিদের সঙ্গে আপনি বহুরাত পদ্মায় কাটিয়েছেন। তাই না?'

'রাতে?' উনি শুনে অবাক, 'আমি দিনেও কখনও ঘুরিনি।'

'আপনি ওদের চিনতেন না?'

'ওই দু-একবার ওদের সঙ্গে বিড়িটিড়ি টেনেছিলাম আর কি।'

'ডাঙায়?'

'না তো কী।' মানিকবাবু বলেছিলেন (হেসে), 'নদীতে? ও-সব মাঝি-মাল্লা আমি চিনি না।'

পদ্মানদীর মাঝিদের সঙ্গে উনি বিস্তর ওঠ-বোস করেছিলেন হেন তথ্য কোথাও পাওয়া যায় না। যাঁরা কল্পনাশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান লেখক তাঁদের পক্ষে ও-ভাবে 'পদ্মানদীর মাঝি' সম্ভব হয়। সূর্য যেন। প্রথমে দেখা দেয় অরুণোদয়ের আলো। তারপর একটু একটু করে কাহিনী ফুটে ওঠে। চরিত্রগুলি একে একে দেখা দেয়। বেলা যত বাড়ে তাদের ছায়া তত লম্বা হয়। এর ছায়া গিয়ে ওকে ছোঁয়। যেন বৃক্ষ; পাতাগুলো এ ওর আলো, ও এর ছায়া মেখে কেমন ল্যাজে-গোবরে।

পদ্মানদীর মাঝি এমনই এক সূর্যস্নাত রচনা। কুবের এমনই এক সৌরসন্তান, যদিও কৌন্তেয়। এখানে লেখক হচ্ছেন সূর্য। আর বিষয় হল কুন্তি। কুমারী কুন্তি সে জবাকুসুমসঙ্কাশে এসে ধর্মাধর্ম হারায় ও সন্তান ধারণ করে।

মানিকবাবুর মতো যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা ওভাবে পারেন। দীর্ঘকাল মোহানার মাঝিদের সঙ্গে জলে-জলে ঘুরে সমরেশ বসু তো ঠাণ্ডার বেশি কিছু লাগাতেই পারলেন না। 'গঙ্গা'-র বেশি কিছু লিখতে পারলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবালের সঙ্গে দেখা হলে তিন বাঁড়ুজ্যের কথা একবার ও তুলবেই। মানিক, বিভূতি আর তারাশঙ্কর। ওর মতে এই ত্রয়ীই বাংলা সাহিত্যের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। এবং এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ হলেন ব্রহ্মা। বিভূতিভূষণের যে গল্পটির কথা ও বারবার বলে থাকে, সেটা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। গল্পটি এরকম: কোনও এক গাঁয়ের বধূ স্বামীর ভিটেয় রোজ দুটি করে রুটি খেতে পায়। সে শুনেছে, তার বাপের বাড়িতে এখনও জনপ্রতি তিনটি রুটি পাওয়া যায়। একদিন সে তাই কুলত্যাগ করল। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে সে উপনীত হল রেলওয়ে স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে এক মেলট্রেন ঢুকছে। আস্তে আস্তে তার সামনে দাঁড়ায় গাড়ির ডাইনিং রুম। সে দেখল, কাচের বন্ধ জানালার ধারে মুখোমুখি দম্পতি এক। তাদের সামনে আহার্যের স্তূপ। তারা প্রচুর হাসছে। স্বামী-স্ত্রী হাসে? হাসাহাসি করে? ক্ষুধার্ত বধূটি খাবার নয়, আশ্চর্য হয়ে গেল তাদের লুটোপুটি হাসি দেখে। প্রবালের মতে মানিকবাবু আহার্যে থেমে গেছেন।

উত্তরে মানিকবাবুর 'মানুষ হাসে কেন?' গল্পটিকে আমি প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাই।

রসময় নামে মফঃস্বলের এক ডাক্তার— 'যে কখনও হাসে না।' যারা তার ডিসপেনসারিতে আসে তারা হাসেটাসে। সবচেয়ে বেশি যে হাসে, ধরা যাক, তার নাম বিপিন। মানিকবাবুর গল্পের চরিত্রদের নামকরণ লক্ষ্য করার মতো। (মানিকবাবুর 'জননী' উপন্যাসে নায়িকার নাম 'শ্যামা' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত কি? এমন কি, 'মা' শব্দটিও কি বেবুঝ অজ্ঞাতসারে ওখানে জুড়ে আছে!)

একদিন কল থেকে এসে রসময় দেখেন, সবাই খুব গম্ভীর। বিপিন হার্টফেল করে মারা গেছে। রসময় বললেন, এই তো পরশু দিন দেখলাম, দু'হাতে দশ লিটারের দু'বালতি জল নিয়ে হাঁটছে। মনে করিয়ে দিলাম, বিপিন, তোমার হার্ট ভাল নয়। 'কী যে বলেন ডাক্তারবাউ।' বিপিন শুনে হাসতে লাগল।

ডাক্তার কল-এ এসেছেন। পাসনে-পরা রোগা প্রফেসরের দশাসই বৌ খাট জুড়ে শুয়ে। স্টেথো তুলে 'এবার আপনার পিঠ দেখব' বলায় অধ্যাপক-পত্নীর মুখ শুকিয়ে এতটুকু। ডাক্তার ভাবলেন, একটু আগে যে বুক দেখাল, পিঠ দেখাতে তার এত ভয় কীসের? স্বামীও কেমন চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। 'পিঠ দেখবেন? আচ্ছা দেখুন', বলে ভদ্রমহিলা পাশ ফিরে শোন। এবং পিঠে স্টেথো ঠেকানো মাত্র খিলখিল করে হেসে উঠে এবং হাসতে হাসতে আলুলায়িত আঁচলে পাশের ঘরে চলে যান। অধ্যাপক মাপ-টাপ চেয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, ওর পিঠে বড় সুড়সুড়ি।' এরকম একের-পর-এক হাস্যের বিবিধ উদাহরণ। এদিকে ডাক্তারের বৌ তাঁর মেয়ের বয়সী। একদিন পাশের বাড়ির নতুন ভাড়াটের মেয়ে জানলা দিয়ে রসময়ের বৌ-এর কাছে জানতে চেয়েছে, 'আচ্ছা আপনার বাবা কী এখন বাড়ি আছেন?' অর্থাৎ, রসময়। এই কথা বলতে গিয়ে রসময়ের স্ত্রী হাসতে হাসতে খুন।

গল্পের শেষে একদিন রসময়কেও হাসতে দেখা গেল বালিকাবধূর ঘুমন্ত মুখের গাম্ভীর্যের দিকে তাকিয়ে। তার এই প্রথম-হাসি আর থামে না। বৌও (বিভূতিভূষণের গল্পের নায়িকার মতো) কখনও হাসতে দেখেনি স্বামীকে। স্বামীর সঙ্গে হাসাহাসি কী জিনিস, জানে না। সে উদ্বিগ্নভাবে বলতে লাগল, 'হ্যাঁগো তুমি হাসছ কেন? তুমি হাসছ কেন? ওগো, কী হয়েছে তোমার!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর দিয়েছেন লেখক। 'হাসি পাইয়াছে তাই রসময় হাসিতেছে। হাসি পাইলে মানুষ হাসিবে না?'

বহুকাল আগে পড়া। তবু শেষাংশটুকু মনে হয়, হুবহু কোট করতে পেরেছি। প্রবালের মতে সমস্ত শিল্পকর্ম হবে সরল এবং স্বচ্ছ। অন্তরে ও বাইরে। আমি ছোট করে বলি, 'হ্যাঁ, অ্যাপিয়ারেন্স সেরকম হতে পারে। অ্যাপিয়ারেন্স হল ৮টা ১০-এর ট্রেন। কিন্তু অনেকদিন তো সেটা ৯টা ৪০-এও ছাড়ে। প্রবালের কাছে এ-সব স্মার্ট কথা। এরা শো-উইনডোর মানেকিন। প্যান্টুল খুললে এদের লিঙ্গ নেই। বিশ্বাস তার কাছে ঈশ্বর। শিল্প হচ্ছে তাই, আর এটাই তার বিশ্বাস, একটা শাশ্বত পটভূমি থেকে যা ক্রমাগত ইঙ্গিত দিতে থাকে। যেমন আকাশ আর তারা।

'আকাশ আর আলাদাভাবে কী', আমি তাকে হেসে বলি, 'মানুষের সামাজিক আকাশ ছাড়া, (এ-রকম হাসিতে আমার একটু উচ্চমন্যতা প্রকাশ পায়ই এবং প্রবাল তা ঘৃণা করে)— যত তারা সব তো ফোটে এখানেই। এই যে আমরা কথা বলছি। আমাদের আগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যত মানুষ কথা বলে গেছে— এমনকি যত ভাষায়— তার রোদ, তার ছায়া তো এখানেই লেগে আছে। মানুষ ছেড়ে আকাশ আর তারা-ফারার কাছে যাওয়ার দরকারটা কী।'...

'শঙ্খ ঘোষের লাইনদুটো তোর মনে আছে প্রবাল?' বলে আমি শুরু করি,

'জল কি তোমার কোনো ব্যথা বোঝে?

তবে কেন, তবে কেন,

জলে কেন যাবে তুমি নিবিড়ের সজলতা ছেড়ে?'

প্রবালের কালো আর ছিপছিপে বাইরের সঙ্গে তার তীব্র কণ্ঠস্বর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফর্ম ও কনটেন্টে মিল আছে। কালো কিংখাব থেকে তলোয়ার বের করে আনে যখন সে বাকিটা শোনায়—

'জল কি তোমার বুকে ব্যথা দেয়?

তবে কেন, তবে কেন

কেন ছেড়ে যেতে চাও দিনের রাতের জলভার?'

দ্বিতীয় পেগেই বেশ ভাবসাব হয়ে যায় আমাদের। কিন্তু তৃতীয় পেগে ফের নড়ে ওঠে তার টনক।

'তারাশঙ্কর সম্পর্কে তোর কী ধারণা?' মুখচোখ গম্ভীর করে সে জানতে চায়।

'দুজন মানুষের ফোটোগ্রাফ পাশাপাশি রাখলে আর একটা অদৃশ্য ফোটোগ্রাফ সেখানে তৈরি হয় কি হয় না, তুই বল। সেটা তৈরি হয় ওই দুটি মানুষের ছবিতে যে তফাত, ওদের দু'জনের মধ্যে যা নেই– সেই সব নিয়ে। তারাশঙ্কর সেই তৃতীয় ছবি।'

ঘাবড়ে দেওয়ার মতোই কথা। অন্তত প্রবালকে। বেচারা শুনে-টুনে কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকে। তারপর হঠাৎ বলতে থাকে 'তোর...।' পুরুষাঙ্গবোধক দু-অক্ষরের মুখ-খারাপ না করে সে আর পারে না, 'এ-সব টেবিল-টক করে-করেই তুই ছেলেমেয়েগুলোর মাথা খেয়েছিস। কেউ কিছু লিখতে পারে না। শুধু বাতেলা মারে। শোন তোকে বলি। তারাশঙ্কর হল রাস্তার ধারে একটা নুড়ি। এ তোর কামু-ফামু নয়। নুড়ি, স্রেফ নুড়ি একটা, বুঝলি কিছু! গান্ডু? শুধু একটা প্রণাম কর গিয়ে। দেখবি শিব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ধরনের কথা বলতে বলতে আমাদের কত বোতল যে নিঃশেষ হয়েছে বা 'বার' হলে কত পাত্তি— তার লেখা-জোকা নেই। ঝুনু যখন বছর পাঁচেকের, একদিন তার লাল-সবুজ মাটির আম (ক্যাশবাক্স) ভেঙে বাজার হয়েছিল। জানতে পেরে, ওহো, সে কি আছাড়-পাছাড় কান্না মেয়ের।

৭। মাতিস, পিকাসো, তারাশঙ্কর ও স্যারিডনের মেয়ে

ঘটনা একটা ঘটতেই হবে। আর, আমার অভিপ্রেত ঘটনাটি হল, রুবি আর একবার, শেষবার, আসুক।

আমার লেখা দেখতে দেখতে বেশ এগচ্ছে। এই তো, ৩৯ পেরিয়ে ৪০-এ পড়ল। অবশ্য, ছাপা হলে ৯-পয়েন্টে পুজো সংখ্যার আর ক'টা পাতা!

এখন সকাল ১০টা। শান্তা এসেছিল, চা দিতে। পেজমার্ক দেখিয়ে হেসে বললাম, 'এই যে।' শান্তা বলল, 'কী?' আমি বললাম, '৪০ চলছে। 'শান্তা বলল, 'ওইটুকুতে কী হবে? আরও তো ১০০ পাতা লিখতে হবে।' হাফ-গেরস্তর যেমন স্বামী, শান্তা হাফ-লেখকের বৌ। কী নিয়ে লিখছি, কী ভীষণ অসুবিধে আমার এবার, জানে না কিছুই।

আজ রথের দিন। ওর ছুটি। ঝুনু নেই, ক'দিন মামার বাড়ি থাকবে। ওখান থেকে স্কুল যাবে। এই সব লেখালিখির, সেই একেবারে গোড়ার দিকে একবার, শান্তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম 'আচ্ছা, ওই সারিডন বিজ্ঞাপনের মেয়েটার নাম তুমি জানো? ওই যে, যে বলে, চোলে গেচে!'

জানতাম, পারবে না বলতে।

এখানে একটা গল্প বলে নিই?

একবার হয়েছে কী, মাতিসের কাছে এক বাচ্চা মেয়ে এসেছে। মডেল হবে। মাতিস বললেন, 'আমার মডেল-ফডেল লাগে না। মন থেকে আঁকি। তুমি পিকাসোর কাছে যাও। ওর এ-সব দরকার হয়।' মেয়েটি ঠোঁট-টোট ফুলিয়ে বলল, 'গিয়েছিলাম তো।' পিকাসো-মাতিসে তখন খুব রেষারেষি বন্ধুত্ব। মাতিসের খুব খাতির, নামডাক। পিকাসো ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে। স্ক্যান্ডালের গন্ধ পেয়ে মাতিস আঁকা থামিয়ে জানতে চাইলেন, 'কী-রকম! কী-রকম!'

'দেখুন না! আমি জামাকাপড় পরে সিটিং দিচ্ছি। উনি আঁকছেন। আর মাঝে মাঝে মাথা নিচু করে, ক্যানভাস ছেড়ে এসে আমার বুকটা টিপে যাচ্ছেন। আমি মৃদু প্রতিবাদ করে বললাম, 'মঁসিয়ো। আপনি তো আমার জামা-কাপড়-পরা ছবি আঁকছেন। নিউড তো আঁকছেন না। তাহলে এ-সবের দরকার হচ্ছে কেন?'

'তা, পাষণ্ডটা কী বলল?' মাতিস উদগ্রীব।

'ছবির মেয়ের বুকটা তুলি উল্টে দেখিয়ে বললেন, যদিও ছবির সঙ্গে আমার একটুও মিল নেই—'

'আঃ, কী বলল, বল না!'

'বললেন, জামার মধ্যে এই যে বুকের কাছটা ফোলা-ফোলা দেখাচ্ছে ছবিতে, তুমি কি মনে কর, এর মধ্যে কোনও মাংস নেই? আমি সেটাই দেখে নিচ্ছি যে কতটা মাংস এতে দিতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আর তাই তুমি চলে এলে?' মাতিস হা-হা করে হাসতে লাগলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন, 'পেন্সিল কাটতে পার?'

মেয়েটি যথাসাধ্য ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ-আ।'

'কই কাটো দেখি!'

মাতিস দেখলেন, মেয়েটি এ ব্যাপারে সত্যিই গুণী। কলের চেয়ে ভাল পেন্সিল বাড়ে। বললেন 'আচ্ছা, তুমি আসবে।'

দিন-পনের গেল। তারপর মাতিস-পত্নী একদিন সন্ধেবেলা সাজুগুজু করে পার্টিতে যাচ্ছেন। স্টুডিওয় ঢুকে বললেন, 'তুমি ঠিক কর। কে থাকবে। ওই মেয়েটা, না আমি? আমি তোমাকে সাতদিন ভাবতে সময় দিলাম।'

সাতদিন পরে জানতে চাইলেন, 'কী ঠিক করলে?' মাতিস বললেন, 'মা শেরি (প্রিয়তমা), আমি ভেবে দেখলাম, বরং তুমি যাও। মেয়েটা থাকুক। কারণ, ওকে আমার দরকার। ভাল পেন্সিল কাটতে পারে।'

অপ্রাসঙ্গিক? না। রুবি হলে বলে দিত সারিডন-নায়িকার নাম। এক কথায়।

আসলে, শান্তা লক্ষ্য করছে, আমি লিখছি কি না। লিখে যাচ্ছি কি না। হোক অনেক পরে। দিগম্বরীর ডাক এই প্রথম। বহু টাকা। আমার এক উপন্যাসে স্ট্যাটাসে ও শচীন-পত্নী অনসূয়ার তুল্যমূল্য হয়ে যাবে। (আর-এ বাবা, আকাদেমি কি আমার বরও পাবে না?)

শুনেছি, পুজোর লেখার সময় তারাশঙ্কর-পত্নী নাকি বিখ্যাত সাহিত্যিককে ছাদের ঘরে শেকল দিয়ে রাখতেন। চা-জলপানি পেতেন জানালা দিয়ে। মাঝে মাঝে জানতে চাইতেন, 'ক সিলিপ (স্লিপ) হল?' বলা বাহুল্য, এ-সব ছাত্রাবস্থায় শোনা। গল্প মাত্র। নিঃসন্দেহে শত্রুদের রটনা। দীনুদা তো আমাদের কম বয়সে ঠাট্টা করে কতদিন বলেছেন, 'শুনেছ হে শচীন, তারাশঙ্কর নাকি আজকাল সনৎকে ভুল করে রথীন বলে ডাকছেন।' সব বাঙালি লেখকের ওই এক বয়সকালের ভীমরতি। রবীন্দ্রনাথ হব। আরে বাবা মানিক বাঁড়ুজ্জে হ না। জীবনানন্দ হ না। শচীনের যে হাল আজ। গোরা লিখবে। দেশ, ইতিহাস, সময়। রবীন্দ্রনাথ যা করেছিলেন। যে-ভাবে হাতে চোঙা ধরিয়ে বলেছিলেন, বাবা গোরা, আমার এই ভাল-ভাল কথাগুলো দেশের লোককে গিয়ে শুনিয়ে এসো তো। এতে দেশের ভাল, তোমার ভাল, আমারও ভাল। কিন্তু তাই কি? মাজন ছাড়া এ-ভাবে আর কিছু কি বিক্রি করা যায়? তাহলে মানিকবাবু গাওদিয়া গ্রামের পথে-পথে শশীর পিছু পিছু চাকরের মতো ঘুরলেন কেন? হ্যামলেট কি কারও কথা শোনার লোক? শেক্সপিয়ার শুধু ঘুরেই মরেছেন তার পিছনে। শুধু দেখে গেছেন, কখন কী করে হ্যামলেট। কখন কী বলে। এলসিনোর দুর্গের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে হাঁটুতে বাত হয়ে গেল তাঁর। শচীন লিখছে দেশ, ইতিহাস আর সময় নিয়ে। আকাদেমি পাচ্ছে। অথচ, জীবনানন্দর কাছে, 'আবহমান কালের ইতিহাস-চেতনা একটি পাখির মতো যেন।' শচীন কি ই এল ডক্টরোর আমেরিকান দেশ-হামারা 'র‍্যাগ টাইম' উপন্যাসটির পাতা উল্টেও দেখেনি? কত, শ'খানেক পাতা বড় জোর? প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝখানের গোটা আমেরিকাটা তার মধ্যেই ধরে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারাশঙ্করকে একবার দেখেছিলাম। টালা পার্কের বাড়িতে। পুজো সেরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলেন। গায়ে ফতুয়া ও পরনে চেক লুঙ্গি। (গলায় রুদ্রাক্ষের মালা?) আমি গিয়েছিলাম প্রতিভার টইটই পূর্ণতা দেখতে। দেখেছিলাম, অসম্ভব ডিসটার্বড একটি ব্যথিত মুখ।

উনি আমাকে ছবির ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। উঁচু দেওয়ালে নিজের হাতে আঁকা ওঁরই চরিত্র সব।

বর্ষার বিকেল। বাইরে মেঘের হাঁকডাক। ঘনঘন বিদ্যুৎ। বিধাতার সে অমোঘ আলোকসম্পাতের মাঝখানে অবাক অভিভূত দাঁড়িয়ে সেদিন মনে হয়েছিল যেন নিষ্কাশিত দীর্ঘ বল্লম হাতে সৃষ্টি ঘেরাও করেছে তাদের স্রষ্টাকে। বিদ্যুতের আলোয়, একটি তৈলচিত্র থেকে হাঁসুলি বাঁকের উপকথার পাখির খোলা স্তন ধকধকিয়ে ওঠে।

এই ঘটনার মাস দুয়েকের মধ্যে উনি মারা যান।

এতদিনে যা লিখেছি, তা কি লেখা? জানি না। শুধু জানি, সাপের মতো খোলস ছাড়তে ছাড়তে আমি এঁকেবেঁকে বেরিয়ে যাচ্ছি— আর, এটা একটা ঘটনা। এর কোনও পাঠক আছে কিনা সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। তাছাড়া, সাপের খোলস ছাড়া বড় জোর একটা দৃশ্য। তার কোনও পাঠক থাকতে পারে কি?

আমার কাছে প্রশ্ন একটাই। রুবি কখন আসবে। রুবি এলে, সেই প্রকৃত ঘটনার হুবহু বর্ণনা দেওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেব বলে আমি লিখে যাচ্ছি। এই সব মৃত পঙ্‌ক্তির গায়ে আমি সেই জীবিতের চামড়া সংস্থাপন করব। দেখব এরা গ্রহণ করে কিনা।

আমার বর্তমান বলে কিছু নেই। ভবিষ্যৎ ছিল না। আমার জীবন ছড়িয়ে আছে শুধু আসন্ন ভবিষ্যতে।

রুবি যখন আসবে।

৮। জলরাশি অন্ধকার

কর্পোরেশনের সামনে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর সেই একবার। তার আগে আমায় কখনও ডাকতে হয়নি রুবিকে। পাঁচ-পাঁচটি বছর ধরে যখন আসার সে নিজেই এসেছে।

ফোন করেছে অফিসে। বা, চলেই এসেছে সোজা। আমি একবার সাহিত্য আকাদেমির একটি সেমিনারে গেছি (ক্বচিৎ এমন), এক লাইন বেরিয়েও গেছে কাগজে, মুষ্টিমেয় শ্রোতার মধ্যে দেখি রুবি। বিনোদন পত্রিকার অফিসে মাঝে মাঝে যাই আড্ডা দিতে। পিওন এসে ভিজিটার্স স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে, 'রিসেপশনে একজন ভদ্রমহিলা...' স্লিপ না দেখেই বুঝি কে। এই তো, ওর বিয়ের ক'মাস আগেও (যদি জানুয়ারির শেষে বিয়ে হয়ে থাকে), জনে জনে জিজ্ঞাসা করে নন্দন-চত্বরের ফিল্ম ফেস্টিভালে আমাকে খুঁজে নিয়েছে। একদিনে পরপর তিনটে ছবি দেখে বাড়ি গেছে। বিয়ের কথা কই আভাসেও বলেনি তো। ঠিকই, সে 'কবে দেখা হচ্ছে' জেনে যায়নি। ও ভাবে সে তো প্রায় সময়েই না জেনে চলে গেছে আগে। এখানে, ওখানে, সেখানে, খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত প্রেস ক্লাবে খুঁজে পেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু একবার দিনক্ষণ জায়গা সব লিখে একটা স্লিপ গুঁজে দিয়েছিল আমার পকেটে। সেই যেবার, ১৯৮৭-তে আমার ছোটভাই-এর ফিউনারালে যোগ দিতে দু'মাসের জন্যে আমেরিকা গেলাম। ২৪ ঘণ্টা ধরে প্যাসিফিকের ওপর দিয়ে উড়ে টোকিওয় এসে দেখি কানেকটিং ফ্লাইট নেই। একদিন হোটেলে থাকতে হল। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে মালপত্র নিয়ে সোজা বেকবাগান। দেখি, ত্রিমূর্তিতে রুবি ঠিক বসে আছে। যদিও আমার তিনঘণ্টা লেট। কথা দিয়ে আসেনি রুবি, এমন হয়নি কখনও।

বরং, তার বহু আমন্ত্রণ আমি পারিনি রাখতে।

ইউ-এস-আই-এস অডিটোরিয়ামে (তখন সুরেন ব্যানার্জি রোডের মুখে) স্পিলবার্গের ই-টি। ঝুনু (তখন ৯/১০) আর শান্তা দেখবে। পাশেই লাইব্রেরিতে রুবির থাকার কথা। গিয়ে দেখি ঠিক বসে আছে। 'দ্যাখো, কিছু মনে করো না।' আমি খুব অ্যাপোলোজাইস করে বললাম, 'মেয়ে কিছুতেই ছাড়ছে না। আর শান্তাও বলছে, ইংরেজি বই, একটু বুঝিয়ে দিতে হবে।'

বেশ শীত পড়েছে বাইরে। দুপুর বলে, ভেতরে এয়ারকন্ডিশানিং মেশিন মৃদুভাবে চালু রয়েছে। বোধহয় তো খুব শীতেই একটু কেঁপে উঠল রুবি। তারপর 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে' বলে শালটাল মুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি কাল এসো, কেমন?' ওর সঙ্গে যেতে যেতে আমি বলি, 'না-না কাল নয়। কাল আমার কাজ আছে। পরশু। এখানে। আর এই সময়ে। ঠিক আছে?' উত্তর না দিয়ে, রুবি শুধু ঘাড় রাখল কাঁধে। দ্রুত হেঁটে চলে গেল।

এসেছিল।

এভাবে ওকে সময় দিতে পারিনি যে কতদিন। কত-না বার। মেয়ের অ্যানুয়াল। আচ্ছা। নেতারহাট যাব শান্তা আর ঝুনুকে নিয়ে। আচ্ছা। এখন পুজোর লেখালিখি— সময় কোথায় বলো তো? কফি হাউসে তরুণ লেখকের সঙ্গে শনিবারের আড্ডা কি বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান সবসময়েই রুবির চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। শেষের দিকে, দেখা-সাক্ষাতের অন্তে রুবি তাই শুরু করত, 'শোনো, কাল-পরশুর মধ্যে কি সময় হবে তোমার' এই বলে। কেন সময় হবে না জানা মাত্রই, 'আচ্ছা, তাহলে নেক্সট উইকে কোনওদিন?' আমি ঠিক দিন দিতে না পারলে, 'ওক্কে, আই শ্যাল গেট ইন টাচ উইথ ইউ— আঁ?' বলে আমার হাতের তালুতে মৃদু চাপ দিয়ে বাস বা মিনিবাসে উঠে যেত।

এভাবে একটানা পাঁচ বছর। এছাড়া মাঝে মাঝে কোথাও ঘর খালি থাকলে সেখানে। আমাদের ফ্ল্যাট খালি থাকলে সেখানে। হোটেলে আমরা যাইনি কখনও বললে ভুল। একবার সদর স্ট্রিটের গ্রিন হোটেলে যাই। বেশ্যা ভেবেছিল রুবিকে। তারপর আর ও-মুখো হইনি।

ক্যালিফোর্নিয়ার রেনো নেভাদা নামে ছোট্ট শহরটি সমুদ্রের ধারে। ওখানকার কাউন্টি হাসপাতালে কলেজে ফিজিওলজি পড়ান ডাঃ চুনীলাল মুখার্জি। (এখন থাকেন কলকাতার সল্টলেকে।) ওখানে জুলাই ১৯৮৭-তে তিনদিন ছিলাম। ডাঃ মুখার্জির ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বসে একদিন একটা অবিস্মরণীয় অ্যানিমেশান ফিল্ম দেখি। তাতে দেখানো হল ফেলাপাইন টিউব থেকে কীভাবে একটি ডিম্বাণু বেরিয়ে এসে ব্যাকুল খোঁজাখুঁজি করল একটি শুক্র-অণুকে। না পেয়ে কত বিষণ্ণভাবে ফিরে গেল। প্রায় মাথাটি হেঁট করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার রুবির কথা মনে পড়ল।

রেনো নেভাদা শহরটি অদ্ভুত। কেমন অতিলৌকিক যেন সব মিলিয়ে। ছোট্ট শহর, লোক সংখ্যা শুনলাম ৭৬৭০। এমনিতে আমেরিকার আর পাঁচটা গঞ্জ-শহরের মতোই— সেই একটা-দুটো সব পেয়েছির বাজার, একটা হেলথ ক্লাব, একটা করে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, পোস্টাপিস, আর ফিউনারাল হোম। নতুন কিছু নয়। অদ্ভুত লাগত এ জন্যেও নয় যে, এখানে সবসময় মেয়েদের চুল উড়ছে, জানালার পর্দা উড়ছে, পুরুষদের জামা উঠছে ফেঁপে। (উড়ন্ত টুপি ধরতে মানুষ ছুটছে, এটা একটা সাধারণ দৃশ্য)। এ তো আমাদের পুরীতেও দেখা যায়। অদ্ভুত এই জন্যে যে, যে তিনদিন ছিলাম, প্রতিদিন দেখেছি, এই ছোট শহরের অধিকাংশ, প্রায় সব মানুষ, সন্ধ্যার পর চলে আসে সমুদ্রতীরে। হাজার হাজার নরনারী এসে ফিসারমেনস হোয়ার্ফ-এর চারিপাশে বসে থাকে। অন্ধকারে পৃথিবীর তিনভাগ জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকে।

রেনো-র রীতিমাফিক প্রথম দিনেই ডাঃ মুখার্জি আমাকে নিয়ে গেলেন সমুদ্রের ধারে।

আমার রুবির কথা মনে পড়ল।

(মনে হল, রুবি আর আমার মাঝখানে এ বিপুল ব্যবধান রচনা করার অধিকার ওই অন্ধকার জলরাশির নেই।)

৯। মৃত্যুর কণ্ঠস্বর

এবার আমি যে ঘটনাটির কথা বলব, তা এই আত্মকাহিনীর সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ঘটনা। বলতে গিয়ে আমার নিজেরই একটু ভয়-ভয় করছে, যদিও ভূত-প্রেতের কাহিনী এ নয়। এও নয় যে ব্যাপারটা খুব পাপ বা ভীষণ দুঃখের, আর তাই আমি ঘটনাটি মনস্থ করতে চাই না। বরং ঠিক উল্টো। এর মতো অসহ্য সুখস্মৃতি আমার জীবনে আর দুটি নেই।

তাহলে ভয় কেন?

ভয় এই জন্যে যে, আমার জীবনে এটাই একমাত্র ঘটনা যা আমার সম্পূর্ণ অলীক মনে হয়। সত্যিই ঘটেছিল বলে আমি কিছুতেই একে বিশ্বাস করতে পারি না। বাস্তবকে স্বপ্নবৎ মনে হতে দেওয়া তো নিজের উন্মাদাবস্থাকে নিজে ডেকে আনার সামিল, তাই নয় কি? ভয় আমার এখানে। কেদারনাথের পথে ঘটা এই কাহিনী আমি তাই ডকুমেন্টারির মতো স্লাইড সহযোগে দেখিয়ে যাব। আমার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভবের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।

হিমালয়ে যাঁরা বেড়াতে যান, সকলেই জানেন, ক্লাইভ স্ট্রিটে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম নামে উত্তরপ্রদেশ সরকারের একটি পর্যটন সংস্থা আছে। পাহাড়ে এরা সর্বত্রগামী। ৬ দিনের প্যাকেজ ট্যুরে কেদার-বদ্রি ঘুরিয়ে আনার প্রোগ্রাম এর অন্যতম। বুকিং এখানে হয়। কিন্তু সফরে যোগ দিতে হয় হৃষীকেশ থেকে।

১৯৮৯-এর জুনে রুবি ঠিক করল অফিস-কলিগদের সঙ্গে ওই প্যাকেজে সে কেদার-বদ্রি যাবে। রুবিদের প্রোগ্রাম এইরকম: ৩ জুন রাতে দেরাদুন এক্সপ্রেস। ৫ জুন ভোরে হরিদ্বারে। ওই দিন রাতে হৃষীকেশ। ৬ জুন প্রত্যুষায় গাড়োয়াল মণ্ডলের অভিভাবকত্বে কেদার ও বদ্রিনাথ যাত্রা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিন আমরা পিপিং-এর কেবিনে। শুনে আমি বললাম, 'আ, কেদার-বদ্রি! সে তো আমরাও যাচ্ছি।'

'সে কী। কখন ঠিক হল। কই, বলনি তো।'

আমি বললাম, 'এই তো, এখুনি।'

'যাঃ।' রুবি বলল, 'ইয়ার্কি নয়। সত্যি যাচ্ছ নাকি তোমরা? কবে যাচ্ছ?'

'আমরা' বলতে কারা জানতে চায় না। সে জানে।

'ওই। তেসরা জুনেই। ট্রেন তো আটটা-দশে বললে। তাই না?'

রুবি অবাক হয়ে গেল খুব। তারপর আরও জেরা করে যখন বুঝল ঠাট্টা করছি না, হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখচোখ, 'সত্যি?' চোখ বড় বড় করে বলল, 'কামরা যদি এক হয়ে যায়?' অস্থিরভাবে সে মাথা ঝাঁকায়, 'না, তেসরা জুন কক্ষনো না। ডোন্ট স্পয়েল মাই গেম।'

আমি বললাম, 'এক হয় তো হোক না। চেনে না তো তোমাকে। চিনবে।'

'না-না। দু'রাত্রির জার্নি। ঠিক কিছু বুঝে ফেলবে।'

'কিছু হবে না। চলো না। মজা হবে।'

'তুমি না—' আমার মুখের কাছে মুখ এনে দাঁত কিড়মিড় করে আর ঘুসি পাকিয়ে রুবি বলল, 'একটি বিচ্ছু। যদি একই কিউবিক্‌লে টিকিট হয়ে যায়। ধরো, সামনের বার্থেই আমি?'

'কম্পিউটারের ব্যাপার। তাও হতে পারে।' আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'তাহলে তো দু'শো মজা। আমাকে একটু ইশারা করে তুমি বাথরুমে গেলে। রাত দুপুর। বগিতে নীল আলো। সবাই ঘুমুচ্ছে। বাথরুমে আমরা দুজন। ট্রেন তখন যাচ্ছে কোডার্মার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।'

'এই, না!' রুবি হাত চেপে ধরে, 'ঠিক ধরা পড়ে যাব।'

'ধরুক না।' আমি হেসে বললাম, 'ধরা পড়লে তবেই তো ছুটি। তারপর তো শুধু তুমি।'

শার্টের বোতাম পটাপট খুলে রুবি আমার বুকে মুখ গুঁজে দেয়।

'তুমি ওখানে ওদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আমার জন্যে কি একটুও সময় হবে তোমার?' সে বলে। (যদি এ-কাহিনীর দায়ভাগ নিতে পারতাম, তাহলে লিখতাম, 'ঘাসের ডগায় ফড়িং-এর মতো সে ডানা কাঁপায়' এবং সংলাপ দিতাম না।)

বাসনাদি-সহ ওর চারজন কলিগ যাচ্ছে। তাই শেষ পর্যন্ত রুবির কথাই রইল। আমি টিকিট কাটলাম ২ জুনের। হরিদ্বারে আমরা একদিন বেশি থাকব। তারপর হৃষীকেশ থেকে আমরা একদিনে একসঙ্গে যাব। যদিও ওরা যাবে গাড়োয়াল নিগমের বাসে। পথে দেখা হবে আমাদের যখন সেখানে বাস থামবে, রুবি বলল। কেদার-বদ্রির সব বাস পরপর ছাড়ে, সে খোঁজ নিয়েছে।

কেদার-বদ্রি যাচ্ছে শুনে ঝুনু রীতিমত লাফঝাঁপ শুরু করে দিল। শান্তাও এক পায়ে খাড়া। টিকিট হওয়ার আগেই নিউ মার্কেট থেকে ওদের দু'জনের জন্যে কিনে আনল গ্লাভস, টুপি আর ড্রয়ার। কলেরার ভুয়ো সার্টিফিকেট জোগাড় করে আনতে বলল আমাকে। 'যমুনেশ আছে তো হেলথে, যাও না'— শান্তা বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫ জুন। কনখলে আনন্দময়ীর আশ্রম দেখে আমরা টাঙ্গায় ফিরছি। তখন বেলা ১২টা হবে। হঠাৎ দেখলাম অটোতে রুবি। দেখলাম, ওর খোলা চুলের কিছুটা অটোর বাইরে পতপত করে উড়ছে। সঙ্গে ট্যুর পার্টির নিশ্চিত-বাসনাদির সঙ্গে আশ্রম দেখতে যাচ্ছে। আজ ভোরেই পৌঁছবার কথা। এবং, এসেছে তাহলে! রুবিও আমাকে দেখতে পেয়েছে। ইচ্ছে হল, হাত নাড়ি। কে, কী বৃত্তান্ত— শান্তার জেরার ভয়ে চেপে গেলাম। কী দরকার। সামনে পথে পড়ে আছে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১৬ কিলোমিটার পথ। তারপর সেখান থেকে কেদারনাথ ১৫ কিমি। পায়ে হেঁটে। পথে দেখা হবেই। পথে দেখা হতে থাকবে।

হৃষীকেশের মুনি-কি-রেতি থেকে কেদার-বদ্রির সমস্ত বাস ভোরবেলায় ছাড়ে। আমরা গিয়ে শুনলাম রাজীব গান্ধী আসছেন পাহাড়ে মিটিং করতে। সব বাস তুলে নেওয়া হয়েছে এবং টিকিট ফেরত দেওয়া হচ্ছে। শান্তা বলল, আমরা তাহলে কাল যাব। আমি বললাম, না। কেদারে বিড়লার গেস্ট হাউসে আমাদের বুকিং রয়েছে শুধু ৭ তারিখের জন্যে। ৮ তারিখে পৌঁছে আমরা কি সারারাত বরফের ওপর শুয়ে থাকব? বললাম বটে শান্তাকে, কিন্তু ওখানে মাসভর বুকিং থাকলেও, আমি ৭ তারিখেই কেদারনাথ পৌঁছতাম। কারণ, রুবি ওখানে থাকবে শুধু ওই একটা রাত। আমি যেজন্যে যাচ্ছি। আমি তো নবকলেবরে প্রবোধ সান্যাল নয় যে চলেছি মহাপ্রস্থানের পথে! কেদার-বদ্রির ভ্রমণ কাহিনী এ নয়। আমি চলেছি ৭ জুন সন্ধ্যা ৬টার সময় কেদারনাথের মন্দিরে রুবি আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে বলে। ছবি দেখিয়ে বলে দিয়েছে, থাকবে মন্দির প্রাঙ্গণের ঠিক কোনখানটায়।

'ঠিক ৬টার সময় মন্দিরে থেকো কিন্তু।' রুবি বলে দিয়েছে, 'তখন আরতি হয়। ঘণ্টা বাজে। বরফ পড়ুক, বৃষ্টি ঝরুক, সব যাত্রী তখন ওখানে আসে। শুধু এই সময়টুকুর জন্যে মন্দিরের বাইরে একটা আলো জ্বলে। জেনারেটরে।'

আসার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়িয়ে, 'তাহলে এসো কিন্তু। ঠিক ৬টায়' এত বলে তার অলোকসামান্য কৃৎকৌশলে যথারীতি ভিড়ে মিশে গেছে সে। তারপরেই বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। খুঁজব যে, সে উপায় আর রইল না।

আর কেউ না থাক, গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে ১১,৬৫৩ ফিট উঁচু কেদারনাথের মন্দির-চাতালে ৭ জুন মোজা পায়ে রুবি ঠিকই দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন বরফ পড়ছে অথবা বৃষ্টি। যখন আরতি হচ্ছে মন্দিরে। যখন আলো জ্বলে উঠেছে মন্দির চূড়ায় ও ঘণ্টা বেজে চলেছে। যখন সন্ধ্যা ৬টা।

একা? হ্যাঁ, একা।

যে কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করে না, আমি যাচ্ছি সেই অবশ্যম্ভাবিতার কাছে। যেতে আমাকে হবেই। এবং, এখুনি।

শুধু একটি বাস, গাড়োয়াল মণ্ডল নিগমের যাত্রীদের নিয়ে আজ কেদার-বদ্রির উদ্দেশে যথাসময়ে রওনা হয়ে গেছে। আর কেউ যাবে না।

আধঘণ্টার মধ্যে আমি এক মাতাল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ঘুম থেকে তুললাম। তাকে কতকটা অ্যান্থনি পার্কিনসের মতো দেখতে ছিলই আর মা'র বয়সী এক গাড়োয়ালি রমণীর কাছ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তর জড়াজড়ি করে সে যেভাবে বিদায় নিল, আমার 'ডিজায়ার আন্ডার দা এমস' ছবিটির কথা মনে পড়েছিল, যা ছিল বিমাতা ও ছেলের অবৈধ প্রণয়ের কাহিনী।

ড্রাইভারের নাম হরদেও সিং। শান্তা আর ঝুনুকে দেখে সে লাল টকটকে চোখে আমার কাছে জানতে চাইল, 'আওর দো যাত্রী কাঁহা?'

'বাস, এহি। তিনো আদমি।'

'তব তো আওর জ্যাদা পইসা চাহিয়ে।' হরদেও জানাল, 'পার হেড আটশো রুপেয়া।'

শান্তা বলল, 'যাতায়াত?'

'হ্যাঁ। রাত্রে গৌরীকুণ্ডে থাকবে।' আমি জানাই।

ঝুনু বলল, 'চলো বাবা!'

'বাবানে বুলায়া।' হরদেও বলল, 'আপলোগকো তো জানেই পড়েগা।'

রুদ্রপ্রয়াগে চা আর জিলাবি খেয়ে হরদেও সিং-এর নেশা বেশ কেটে গেল। দেখলাম সে একাধারে গাইডও বটে। শান্তার উদ্দেশ্যে সে বলে যায়, ওই যে অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর সঙ্গম। ওই পথ গেছে বদরিবিশালে। আর আমরা এই পথে যাব কেদার। ঝুনুকে জানায়, এই যে করবেট সাহেব ওইখানে চিতাটাকে গুলি করে মারেন। ওই দেখ খোকি, তার স্মৃতিস্তম্ভ। এই পিপল গাছটা থেকে গুলি করেন। 'উয়ো দেখিয়ে সাব রুদ্রনাথজিকা মন্দির' বলে সে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। তার অঙ্গুলি-নির্দেশে সেদিকে তাকিয়ে আমি দেখলাম, মন্দির ছাড়িয়ে, আরও দেড়-দু'হাজার ফুট উঁচুতে, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা সাদা রঙের বাস চলেছে। এখান থেকে সিগারেট বাক্সর মতো ছোট্ট দেখায়।

রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছেই আমি খবর নিয়েছি গাড়োয়াল মণ্ডলের বাস 'করিব আধাঘণ্টা' আগে চলে গেছে। তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে আমি জানতে চাই, 'ভাই, উয়ো ক্যা—'

'হাঁ। রুদ্রনাথজিকা মন্দির। পূজা-উজা দেনা হ্যায় ক্যা মা জি? বলিয়ে, তো লে চলে।'

'নেহি, নেহি।' আমি বললাম, 'উয়ো যো বাস যা রহা হ্যায় না—'

'হাঁ। গাড়োয়াল মণ্ডল কা বাস। আপকো কোঈ যাত্রী হ্যায় উসমে ক্যা?'

আমি বললাম, 'নেহি। নেহি তো।'

আমাদের ট্যাক্সি ছাড়ল। বাঁদিকে হাজার হাজার ফুট নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে দুধের নদী মন্দাকিনী। শান্তার ঢুলুনি শুরু হয়েছে। কত না সুন্দর দৃশ্য দিকে দিকে। (দ্রঃ মহাপ্রস্থানের পথে)। ঝুনু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বারবার। আমি শুধু মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি পাহাড়ের গা বেয়ে তরতর করে উঠে যাচ্ছে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের সাদা রঙের বাস— ক্রমেই বড় হচ্ছে। এরপর রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গৌরীকুণ্ড এই ৭৫ কিমি পথ বাসটির কখনও ছোট কখনও বড় বহু সময় ধরে তার অন্তর্ধান দেখতে দেখতে পাহাড়ের গায়ে তার হারানো-ভেড়া-খুঁজছে আমার এমন এক পূর্বপুরুষ গাড়োয়ালি পশুপালকের সঙ্গে আমি একাকার হয়ে যাই।

রুদ্রপ্রয়াগে লাঞ্চ। ৪টে নাগাদ চা-টা খাওয়ার জন্যে যোশীমঠে পৌঁছে ট্যাক্সি দাঁড়াল। দেখলাম, গাড়োয়াল মণ্ডল নিগমের বাসযাত্রীরা বাসে উঠছে। সবার শেষে খুবই অবসন্নভাবে উঠল রুবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃষীকেশ থেকে আজ যে কোনও বাস ছাড়েনি, এতক্ষণে ও নিশ্চয়ই শুনেছে। ও জানে যে, আমরা নিচে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছি। ওরা আজ গৌরীকুণ্ড, কাল কেদার, পরশু বদরিনাথে একদিন করে থাকবে। তারপর চিলা ফরেস্টে দু'দিন রেখে ট্যুরিস্ট বাস ওদের ১১ তারিখে হৃষীকেশে ছেড়ে দেবে। ওর সঙ্গে এ-যাত্রায় আমার আর দেখা হবে না, রুবি বুঝতে পেরেছে।

যোশীমঠে ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখা দেওয়ার সুযোগই হল না। ওদের বাস ছেড়ে দিল। দেখলাম কলকাতার শীতে যে শীতবস্ত্র পরে না, সে পরে আছে মেরুন সালোয়ারের ওপর ছাই-রঙা ডাবল-নিট সোয়েটার। হলুদ উইন্ড-চিটার তার ওপর। টুপি সে এখনও পরেনি। তাকে বড় উস্কোখুস্কো দেখায়।

ঝুনু ঘোড়ায় যাবে। টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে, সকালবেলা শান্তার জন্যে ডান্ডির দরদাম করছি, এমন সময় দেখি, সামনে দিয়ে রুবি হেঁটে চলে যাচ্ছে। এখন তার গায়ে ভারি লেদার জ্যাকেট, মাথায় টুপি, পায়ে সাদা অ্যাডিদাস। হাতে লোহার-নাল পরানো কেদারের লাঠি। আমার হাতে লাঠি দেখে বুঝে নিল আমিও হাঁটব। (আমাকে দেখে রুবির প্রতিক্রিয়া বা তাকে দেখে আমার— সে-সবের মধ্যে আমি যাব না, যাচ্ছি না। কেন না, আমি শুধু স্লাইড দেখাচ্ছি।)

তবে, যাঁরা কেদার গেছেন, জানেন, গৌরীকুণ্ড থেকে ১৫ কিমি দূরে কেদারনাথ পর্যন্ত একটাই সরু পাহাড়ি রাস্তা, উৎরাইহীন একটানা খাড়া, যা ঘোড়ার পূরীষ ও মূত্রে, বরফে-বৃষ্টিতে পিচ্ছিল— যুগ যুগ ধরে কখনও পরিষ্কার করা হয়নি। এ-পথে সবাই একা, কে কখন পৌঁছবে, কে কোথায় কতক্ষণ বিশ্রাম নেবে, কিছুই ঠিক নেই। কেদার পৌঁছে সকলের পুনর্মিলন হয়। অনেকেই মাঝখানে রামবাড়া চটিতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে কেদার যাত্রা করে।

৪ কিমি একটানা উঠে জঙ্গল চটি। খুব আশা করেছিলাম পাথরের ওপর বসে চা খাচ্ছে রুবি, পিছনে এক অবর্ণনীয় নিসর্গ-শোভা নিয়ে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে গেছে কেদারের পথ, পিঁপড়ের মতো সার দিয়ে চলেছে ঘোড়া ও মানুষ, নিচে দুগ্ধধবল মন্দাকিনী— এই দৃশ্যে তাকে দেখতে পাব। যখন তার দলবল এগিয়ে গেছে। যখন শান্তার ডান্ডি আর ঘোড়ার পিঠে ঝুনু কখন চলে গেছে তার সামনে দিয়ে— রুবি আমাকে এই সব বলবে। কেদার অবধি আমরা একসঙ্গে হেঁটে যাব।

চটির পর চটি পেরিয়ে গেলাম— রুবি কোথাও নেই। মাঝামাঝি রামবাড়া চটি পর্যন্ত উঠে আমি আর পারলাম না। ঘোড়া নিলাম। পথে একটি মৃতদেহ পড়ল। তাকে ঘিরে বিলাপরত আত্মীয়বন্ধু। কেদারের ঠিক আগে গরুড় চটিতে বসে চা খেতে খেতে আমার ঘোড়েওয়ালা আমাকে জানাল, গত বছর তার যে ঘোড়াটি পাহাড় থেকে পড়া শিলাখণ্ডের আঘাতে যাত্রী-সহ খাদে পড়ে যায়, সে-ই ছিল তার প্রকৃত বন্ধু। এ পৃথিবীতে শুধু সে তার মনের কথা সবটা বুঝতে পারত। 'ছোটা ভাই থা হামারা, সাব—' বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। গভীর, গভীরতম সমবেদনা থেকে আমি তাকে বললাম, 'হ্যাঁ, মানুষের পৃথিবীতে মাত্র একজনই যদি তোমাকে বুঝে থাকে, আর সে যদি হয় একটা ঘোড়া, তাহলে এ বড় গভীর দুঃখের ব্যাপারই বটে।' (কিন্তু, এ-সব তো বলার মতো কোনও কথা নয়। এ তো নয় কেদার-বদ্রির ভ্রমণ-কাহিনী।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক ছ'টার সময় মন্দিরের চূড়া জ্বলে উঠল। ঘণ্টা বাজতে লাগল। আরতি শুরু হয়ে গেল। একটু আগে প্রায় মিনিট-পনের ধরে বরফ পড়েছে। এখন বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। মন্দিরের উঁচু চাতালে বরফের কার্পেট। আপাদমাথা একটা গোলাপি রেনকোটে ঢেকে দেখি রুবি চুপটি করে দাঁড়িয়ে। শীতবস্ত্রের ভারে একটু নুয়ে পড়েছে ওর শরীর। বহরেও ডবল দেখাচ্ছে।

'রামবাড়ায় দেখলাম তোমাকে, ঘোড়ায় উঠলে। আমরা নিচে একটা দোকানে চা খাচ্ছিলাম।' অপরাজিতার হাসি হেসে রুবি বলল, 'আমি সবটা হেঁটে এসেছি।'

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, 'এসো আমার সঙ্গে।'

রুবি বলল, 'কোথায়?'

'এসো না!'

আমার হাত ধরে রুবি বলল, 'আমি আর হাঁটতে পারব না গো। আমার হাত-পা সব ভারি হয়ে গেছে।'

'এসো। তোমার পা টিপে দেব।'

'কোথায়?'

'এসো।' আমি ওর কোমরে হাত রাখি। ডাকি ওর সর্বস্বকে।

'ওরা?'

'মন্দিরে। আরতি শেষ হলে রামকৃষ্ণ মিশনে খেতে যাবে। আমি ৭টার সময় সেখানে যাব।'

'মন্দিরে যাবে না?'

আমি এবার ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। পথের ক্লান্তিতে চোখদুটি স্তিমিত হয়ে এসেছে, ঠোঁট ফেটে দেখা দিয়েছে রক্তরেখা— তবু কী অদ্ভুত শান্তি ওর মুখেচোখে। অলীকতার স্পর্শ নেই, নিজে ছুঁয়ে দেখতে পারি এমন একটা বাস্তবতার বিষয়ে আমি এখানে না বলে পারছি না: জল থেকে তুলে নেওয়া একটা দাঁড় যেন সে, যা থেকে জল ঝরে পড়ছে জলে।

কেদারনাথের শীত-ফীত কি বরফ-ঢাকা পাহাড় ও নদী— এ-সবের কথা আর বললাম না। কেন না, কেদারের ভ্রমণ-কাহিনী এ নয়। এ হল ৭ জুন ১৯৮৯ যখন সেখানে বন্ধ ঘরের মধ্যে লেপ-তোশক পর্যন্ত বরফ— কেদারনাথের সেই অসহ্য শীতে বিড়লা গেস্ট হাউসের দোতলার ঘরে শুধু জননেন্দ্রিয় ও ওষ্ঠদ্বয় ব্যবহার করে (ইগলুর মধ্যে এস্কিমোরা যেমন), এ হল আমাদের আনগ্ন সোহাগ, জড়াজড়ি, চুম্বন ও ধর্ষণ, প্রেম, পায়ুকাম ও ব্যভিচার তথা সর্বোপরি (মন্দিরে না গিয়ে) দেবভূমিতে পাপবিহ্বল সঙ্গমের মাধ্যমে আমাদের চরম রতিপ্রাপ্তির কাহিনী। শত শৃঙ্খলমুক্ত শরীর যা বলতে চায় তাকে তা বলতে দিলে আসে যে-সব অনুচ্চারণীয় অশ্লীল ভাষা— তাই ছিল এ আরাধনার মন্ত্র। বস্তুত, যৌনতায় এখানে মৃত্যুপ্রসঙ্গ ওতপ্রোতভাবে ছিলই এবং সেভাবে, যেভাবে ফাঁসিতে ঝোলাবার পর প্রতি শহিদের লিঙ্গ সুদৃঢ় ও প্রলম্বিত হয়। 'ইউ এস আই এস'-এ তুমি আমাকে চলে যেতে বলে বৌ আর মেয়েকে নিয়ে সিনেমা দেখলে— আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল। আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল।' আমার মুখের ওপর উপুড় হয়ে মুখ রেখে একথা রুবি সেই একবারই স্বীকার করেছিল কেদারনাথে, 'কাঁদতে কাঁদতে ভাগ্যিস ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নইলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে রাতেই আত্মহত্যা করতাম, জানো?' বলতে বলতে তার চোখ থেকে জল সরাসরি আমার চোখের মধ্যে এসে পড়ে। তখন, যখন ধ্বনি শেষে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

মানুষের ব্যক্তিগত পৃথিবী তার নিজের চারিদিকে ঘুরে যায় কত দ্রুত। দু-এক মুহূর্তের মধ্যে এখানে রাত হয়ে যায় দিন। দিন হয়ে যায় রাত।

সেই কেদারনাথের রুবি দেড় বছরের মাথায় টেলিফোনে আমাকে বলল, 'না।'

ফোনের পরপার থেকে মৃত্যুর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

১৪। দা থ্রি মাস্কেটিয়ার্স

দেখতে দেখতে জুলাই পড়ে গেল। দীনুদাকে আজ এই সব পাতা-৫০ দেখালাম। ছোট করে লুফে খামসুদ্ধু শুধু ওজনটা দেখলেন। বললেন, 'এ কি। এতে তো পঞ্চাশটা স্লিপও নেই।' যাই হোক, উনি প্রেসে দিচ্ছিলেন। আমি অনুনয় করে বললাম, 'দেখুন, আগের কপিগুলো কাছে থাকলে সুবিধে হয়।'

'না থাকলে লিখতে পারবে না?'

'আজ্ঞে না। ঠিক তা নয়—'

চশমা নাকের ডগায় নেমে এল দীনুদার। কিছু বললেন না। শুধু দেখলেন। ভাবখানা, বাছা, তুমি ডোবাবে না তো? আমি ঢোক গিলে বললাম, 'শচীন, আদিত্যবাবু, সুলক্ষণা দেবী— এরা কি সব দিয়ে দিয়েছেন?'

উত্তরে খামটা আমার দিকে ঠেলে দিলেন দীনুদা, 'তাহলে ওই কথাই রইল। ২০ তারিখেই সবটা দিও।'

প্রেস ক্লাবে গিয়ে দেখি, প্রবাল আর পিনাকী সেনগুপ্ত বারান্দায় বসে আছে। উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল পিনাকী। পিনাকী চন্দ্রবিন্দুর সম্পাদক।

'আসানসোল থেকে কবে এলে পিনাকী?'

'আমার তো দাদা জানেন। আজ এসেছি। কাল থাকব। পরশু চলে যাব। বেয়ারা!' শিবনাথকে ডেকে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'পেগ লে আও।'

বার্নপুরের কারখানায় পিনাকী একজন ইঞ্জিনিয়ার। শচীন কি ওকে দলে টানছে? একদিন ক্যালকাটা ক্লাবেও নিয়ে গেছে, আমি খবর পেয়েছি। সেখানে খোঁচা দিয়ে আমি বললাম, 'পেগ লাও? আরে, এটা প্রেস ক্লাব। ক্যালকাটা ক্লাব নয়। এখানে, মাল দাও শিবনাথ!'

পিনাকী একটু দমে গেল। আমি পিনাকীকে ভালবাসি। ভাল পদ্য লেখে। অসামান্য একটি সাহিত্য-পত্রিকা বের করে চলেছে মফস্বল থেকে। ওর কাগজেই শচীন সর্বাধিকারীকে নিয়ে ডঃ চেল-এর লেখাটা বেরিয়েছিল।

'সল্টলেকে শচীনদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। লেট নাইটে শুক্রবার একটা ফিল্ম দেখাল ডস্টয়েভস্কির জীবনের শেষ ক'দিন নিয়ে। দেখেছেন প্রবালদা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাল বলল, 'না।'

'আপনি?'

'না তো। কেন, কী হয়েছে?'

'না হয়নি কিছু।' পাইপ ধরাবার ছুতোয় চুপ করে গেল পিনাকী।

তারপর বলল, 'এবার আকাদেমি পুরস্কার নিয়ে কী কাণ্ড হয়েছে শুনেছেন প্রবালদা?'

'না তো?'

'কী করেন কলকাতায় বসে। খালি মাল খান। আমরা তো আসানসোলে বসে সব জানতে পারি।'

দ্বিতীয় পেগের উদাসীনতা থেকে প্রবাল জানতে চাইল, 'যথা?'

'এবার তো নিতম্বিনী হালদার পাচ্ছেন। সোমবার মিটিং ছিল। দিল্লি থেকে ফোন পেলাম। ডিসিশন হয়ে গেছে।' নিতম্বিনী বলতে কে, আমরা বুঝেছি। কবি কুমুদিনী হালদার।

প্রবাল উঠে বসল, 'দ্যাট হোর?'

'ইমেজ! অ্যান ইমেজ প্লিজ!' কার যেন কথা, বিখ্যাত সংলাপ কোনও নাটকের, একটু ঘুরিয়ে দিয়ে পিনাকী বলল, 'ইউ নিড আ পিন, টু ফিক্স দা কুইন—'

প্রবাল বলল, 'দোতলা বাস?'

'আ-হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! দ্বৈত হাস্যধ্বনি।

আমি ঠিক ধরতে পারিনি।

'কী ব্যাপার? দোতলা—'

'হুঁউ! বাস! ও-বাসে তুমি ছাড়া আর কে না চড়েছে গুরু।'

দ্বিতীয় রাউন্ডে একদম জমিয়ে দিয়েছে পিনাকী। একবার করে পাইপ নিভছে। ধরাচ্ছে। আর তারপরেই একটা করে ছুঁচোবাজি ছাড়ছে। নিজে জ্বলেপুড়ে সে যে কাকে জ্বালাবে তা অননুমেয়। অফিস সুরাটে পাঠিয়েছিল। বুঝলে প্রবালদা। বার-ফার নেই। মদ পেতে পারমিট লাগে। বলতে হয়, আমি অসুস্থ আর একটু মদ-খাওয়া আমার পথ্য। ডাক্তারের সার্টিফিকেট কিনে মদের দোকানে গেছি। হাতে ধরিয়ে দিলে হিন্দি দরখাস্তের ফর্ম। ভর্তি, বললে, ইংরেজিতেও করা যাবে। তা, ফর্মের প্রথমেই দেখলাম ১ নং— শরাবিকা নাম...। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। যাই হোক, নাম লিখলাম। তারপর ২ নং— শরাবিকা পতা...'

এবার আমরা তিনজনেই হো-হো করে হেসে উঠলাম।

'শ্‌শ্‌শ্‌।' মুখে আঙুল দেয় পিনাকী, 'শোনো না। ঠিকানা লিখলাম।

তারপর এল ৩ নং— শরাবিকা বাপ কা নাম।

প্রবাল 'এনকোর' 'এনকোর' বলে টেবিল চাপড়ে চিৎকার করে উঠল।

'তা তুমি কী করলে?'

হঠাৎ জলদগম্ভীর স্বর শুনে দেখি শচীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে, তুমি কখন এলে?'

'বসুন শচীনদা।' পিনাকী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

'বোস শচীন।' আমি বললাম, 'হঠাৎ কোত্থেকে?'

'গন্ধে গন্ধে চলে এলাম।' শচীন বসতে বসতে বলল। ওর বসার ভঙ্গিও দেখতে দেখতে কত পাল্টে গেল। যেন ইতিহাসে আসন গ্রহণ করছে।

শচীন এসে দু পেগ রয়াল চ্যালেঞ্জ অর্ডার দিল। ক্ল্যাসিক বের করে রাখল টেবিলে। নিজে একটা ধরিয়ে লাইটারটা পকেটে রাখল। দশ বছর আগে আমস্টারডামে কেনা লাইটারটা আজও হারায়নি শচীন?

'তা তুমি কি করলে? বাবার নাম লিখলে, না লিখলে না?'

শচীনের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করার ভঙ্গিমা করে পিনাকী বলল, 'দাদা, আপনি অন্তর্যামী!'

বেশ জমে উঠেছিল আমাদের। কিন্তু, শচীন আসতে হাওয়া গেল ঘুরে। সবাই কেমন সতর্ক হয়ে পড়লাম। এখন থেকে বুঝেসুঝে কথা বলার পালা।

শচীন প্র্যাগমাটিক মানুষ। যে বোঝে মেদ্দা কথাটা। যে, যে যতই বোলচাল মারুক, মানুষ সেই প্রিমিটিভ স্তরেই থেকে গেছে। অর্থাৎ কিনা, সেক্স, সিকিউরিটি অ্যান্ড হাঙ্গারে।

সে প্রথমেই জানতে চাইল, আমরা কী খাচ্ছি? শিবনাথকে ডেকে বলল, 'এদের রাউন্ড দাও।' তারপর খাবারের অর্ডার দিল। তারপর চুপ করে গেল। অর্থাৎ, শুনব। তোমরা কথা বল।

বোঝা গেল আজ শচীনই হোস্ট। সে আসার পর যা বিল হবে শচীন মেটাবে। এমনটাই হয়ে আসছে। অনেকদিন পরে আজ ত্রিমূর্তি আমরা একসঙ্গে। আমি, শচীন আর প্রবাল।

শচীনের শেষ কিস্তি আজ বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে। (রুবি কি দু-একদিনের মধ্যে যোগাযোগ করবে না? আমিও পারব। শুধু একবার দেখা করো রুবি। দেখা দাও!)

প্রবালের লেখার কথা ছিল শারদীয় বিনোদনে। বাইশ না দিলেও ওরা বারো দেয়। এবার নাকি পনের দিত। প্রবাল সময় থাকতেই বলে দিয়েছে, ও লিখতে পারবে না। এ জন্যে ও বেশ উত্তেজিত। কিছুটা গর্বিত।

'এভাবে লেখা যায় বছরের পর বছর?' প্রবাল বলছিল, 'এক-একটা পুজো-সংখ্যা আসবে আর ওমনি ল্যাঙ্গুটি এঁটে— ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যাঃ!' আমার দিকে তাকিয়ে, 'তোর কিছু হল?'

আমি বললাম, 'না!'

শচীনের ঠোঁটে গ্লাস। রিমলেস ফোটোক্রোমাটিক কাচের ভেতর দিয়ে চোখ সরু করে সে আমার দিকে তাকায়।

'বলে দে। বলে দে।' প্রবাল বলল, 'পারব না। এভাবে টাকার টোপে লিখতে। ঘুষের অফিসে চাকরি করিস। ঘুষ নে।'

প্রচুর খাবার-দাবার এসে গেল। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শচীন যথেষ্ট খরচ করে। অকৃপণ ও উদার বলেই সে সর্বত্র স্বীকৃত। কিন্তু, আমি ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখি। শচীনের চোখে অপরাধ আমার একটাই। আমি বুঝতে পারি। আমি ওর অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পাই। নইলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মতো সাবমিসিভ, লো-প্রোফাইলের মৃদুভাষী ওর বন্ধুমহলে আর ক'জন? কথাগুলো নিজের সম্পর্কে। তাই সাবমিসিভ, লো-প্রোফাইল, মৃদুভাষী এগুলো সেভাবে বললাম, যেভাবে 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন' না-বলে লোকে বলে 'আপনি কি এটা ঠিক বললেন?' শচীন আমাকে একজন মোরগ-হৃদয় কাওয়ার্ড বলেই জানে।

সেই ক্যালাইডোস্কোপে শিশুর অবোধ হর্ষে আমি শুধু দিই একটি টোকা। দেখি, একেবারে অন্যরকম প্যাটার্ন। রীতিমত অদৃষ্টপূর্ব। দেখে অবাক লাগে আমার।

শচীন মনে করে এবং বারবার কথাবার্তা ও আচার-আচরণে মনে করিয়ে দেয় যে, সে সোজা-সাপ্টা, খোলা মনের মানুষ। তার লুকোবার কিছু নেই। এই ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে সে সফল হয়েছে। প্রায় সবাই তো মেনেও নিয়েছে।

একটা উদাহরণ দিই। সেই যখন লোকে আমাদের বলত থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আর আলেকজান্দার দুমার খোঁজে আমরা গিয়েছিলাম তোপচাঁচিতে। একটা দেহাতি মেয়ে সারাদিনের চেষ্টায় (চেষ্টা আমার) জোগাড়ও হল, নাম তার ফুলবাসিয়া। তার টেরিকাটা, বিড়িখোর ছোটভাইকে নিয়ে মেয়েটা সন্ধেবেলা বাংলোয় এল। সংগ্রহ আমার। সর্বসম্মতিক্রমে আমি গেলাম পাশের ঘরে। আমি দেখলাম, বিছানা নয়, মেয়েটি জুট কার্পেটের ওপর প্রস্তুত হয়ে শুয়ে। শাড়ি সরিয়ে স্তনে হাত দেওয়া মাত্র বুঝি, সেখানে খাজুরাহো। সে এত জোরে নিঃশ্বাস ফেলে যে তার বুকের ওপর আমি কেঁপে উঠি এক নিবিড়, অভাবিত ভয়ে। শচীন ভদ্র, কিছু বলবে না। কিন্তু প্রবাল গুণ্ডা। এর শেষ দেখে গেলে, প্রবাল বেরনোমাত্র আমাকে পেটাতে শুরু করবে এতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই 'ছায়াছবির বাকি অংশ খবরের পরে' মেয়েটাকে এরকম বুঝিয়ে, আমি বাইরে গিয়ে প্রবালকে পাঠাই। কিছুক্ষণ পরে প্রবাল বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে। শচীনও তৈরি ছিল। কিন্তু ওর চান্সই এল না। কেন না, কথা হয়েছিল একটা শটের।

কিন্তু এটা গল্প নয়। গল্প হল, ওর ভাই বনমালী যখন বখশিস নিতে এল, তখন। শচীন তার গালে একটা প্রকাণ্ড থাপ্পড় মেরে বলল, 'বাস্টার্ড। লজ্জা করে না তোর। বোনকে বিক্রি করে বখশিস চাইতে এসেছিস?'

শচীন রেগে গেলে রাগ করে, দুঃখ পেলে দুঃখিত হয়, সে যখন সঙ্গম করে শয্যাসঙ্গিনী বোঝে তার কাম জাগ্রত হয়েছে। (আমি তো দেখি, সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। আর একজন কে আমার মধ্যে ঢুকে পড়ে ও দু'অক্ষরের সেই বাংলা জিনিস করে পালিয়ে যায়। আমি পড়ে থাকি।) বস্তুত, পায়খানা পেলে পাজামার দড়ি হাতে পায়খানার দিকে দৌড়তে তাকে সেই যুবাবয়স থেকে কত দেখা গেছে। আমি শচীনের কথা বলছি।

এক কথায়, সে শচীন সর্বাধিকারী, বিশ্বাসযোগ্য। অথচ, যাই বলুক যে, কাম-ক্রোধ-লোভ আদি রিপুগুলি কেউ আর সেই একমাত্রিক প্রিমিটিভ ফর্মে নেই। সবাই পাল্টে গেছে। কামের গর্তে ঢুকে পড়েছে শোক, শোকের গর্তে ক্রোধ (বোলতার চাক যেন)— মৌলিক অনুভবগুলি এ ওর গর্তে ঢুকছে আর বেরচ্ছে। (মাথার চাকের মধ্যে যে অবিরাম স্থানবদল একদিন পাগল হ্যামলেটও পারেনি সহ্য করতে এবং বিড়বিড় করে বলেছিল, 'ওয়র্মউড! ওয়র্মউড!'— যখন কানে বিষ ঢেলে তার পিতৃহত্যার নাটক অভিনীত হচ্ছে খুনি বিপিতা ও মা গার্টরুডের সামনে।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু হায়, অধিকাংশ মানুষ আজও মনে করে, এরা আলাদা। এমন একজন শুধু সৎ মানুষ, শুধু নির্লোভ মানুষ হতে পারে— যে মুখে-মনে এক। তারা বিশ্বাস করে। ক্যালাইডোস্কোপে, কেউ টোকা দেয় না।

শচীন সুযোগ নিচ্ছে মানুষের এই দুর্বলতার। এতে তার অসৎ থাকতে, সীমাহীনভাবে লোভী থাকতে (যেমন মেয়েরা তাকে প্রেমিক মনে করছে বলে পেশাদার ব্যভিচারী হতে) সুবিধে হচ্ছে। কিন্তু, এ-সব বোঝার ক্ষমতা শচীনের আর নেই। নিজের শস্যখেতের বেড়ার ধারে বসে সে আজ স্বয়ং ওই পাহারাদার কাকতাড়ুয়া।

তৃতীয় পেগ শেষ করে (তার আগে মুখ খোলে না), শচীন আমার উদ্দেশে বলল, 'এটা জেনে রাখবে যে, যে লোভী নয় আমি শ্রদ্ধা করি শুধু তাকে। এই আমার শেষ কথা। এটা তুমি জেনে রাখো বিল্ব।'

যদিও শচীনই বিল মেটাবে, আমিও চার পেগে চলেছি। 'আমারও শেষ কথা তুমি শুনে রাখো ভাই। আমারও ঢের বয়স হল। অন্তত শুনে রাখো।' আমি বললাম, 'ও-সব লোভ-টোভ সৎ-অসৎ, সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে মানুষের বেঁচে থাকার কোনও সম্পর্ক নেই। জাস্ট বেঁচে থাকাই জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, তুমি সেই জায়গায়?' শচীন আমাকে ধমক লাগায়।

'তা নয়। আমি একটা আইডিয়াল সিচ্যুয়েশানের কথা—'

'ও, ফিলোজফি?' শচীন ঠোঁট ওল্টায়, 'ধুস!'

প্রবাল বলল, 'যার ডিজায়ার নেই, সে তো মৃত।'

দুঃখ হয় প্রবালের মুখে এই সব তোতাবুলি শুনলে। প্যাটার্ন একটা পেলেই হল। কিছুতে নাড়িয়ে দেখবে না। আমি নাড়িয়ে দিলে তখন স্বীকার করবে, তাই তো। যেমন, একটু আগে আমি যখন বললাম, 'যার কিছু নেই, সেই আছে শ্রেষ্ঠ অবস্থায়।' বাঁকা হেসে ও বলল, 'বুনো রামনাথ?' আমি যখন বললাম, 'কে তা জানি না। তবে শ্রেষ্ঠ অবস্থা ওটাই। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ অবস্থা হল, যার যত কম আছে সে'— ও তখন কিছুটা বুঝতে পারল আমাকে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে বলে বারান্দা ছেড়ে আমরা ভেতরে চলে এসেছি। শচীন আবার অনেকক্ষণ চুপ করে আছে। যত নাম হচ্ছে শচীনের, ওর কথা তত কমে আসছে। আজকাল এ-সব আন্ডারডগদের ক্লাবে ও আসে না। স্তাবক নিয়ে ক্যালকাটা ক্লাব-ফ্লাবে বসে। তাদের অনেকে নাকি কথা বলার আগে ওর মুখ থেকে এক অদৃশ্য নিক্তি বেরুতে দেখেছে।

বাচ্চা একটা মুসলমান ছেলে (ওর নাম সেলিম) শচীনের হিন্দু পা থেকে জুতো খুলে নিচ্ছে। তেলচিটে খালি গা, পরনে নোংরা শর্টস। তর্জনী আর অনামিকায় জুতো দুলিয়ে ছেলেটা চলে যাচ্ছে, এমন সময় শচীন ডেকে বলল, 'এই দাঁড়া, দাঁড়া। একটু পেচ্ছাপ করে আসি।'

ছেলেটা ফিরে এসে ওর পায়ে জুতো পরিয়ে দেয়।

বিল-টিল মিটিয়ে দিয়ে শচীন উঠল। যাওয়ার আগে ফের বলে গেল, হ্যাঁ, যার লোভ নেই, সেই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানুষ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই হচ্ছে শচীন। উঠবে মারুতিতে। আমাদের সঙ্গে দু-এক পেগ খাওয়া হল। এখন যাবে হোটেল হিন্দুস্তান কি ক্যালকাটা ক্লাবে। আমাদের এখানে রেখে। তা যাক। কিন্তু শ্রদ্ধা করে নির্লোভকে। এবং, প্রকাশ্যেও তা ঘোষণা করতে লজ্জা পায় না। সে খোলা মনের মানুষ। তার লুকোবার কিছু নেই। এ যেন নান-মারানে পাদ্রি এক, চোঙা ফুঁকে যে 'ঈশ্বরের মাহাত্ম্য' নামে মাজন বিক্রি করছে। ইচ্ছে হয় ডেকে বলি, 'তা নির্লোভকে শুধু পেট্রনাইজ করলেই তো হবে না ভাই। নিজেও একটু প্র্যাকটিসও করো?'

এতক্ষণ পিনাকী কোনও কথাই বলেনি। সে যে ছিল, ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রবাল ভোলেনি।

'হ্যাঁ। ডস্টয়েভস্কি... কী যেন বলছিলে তুমি পিনাকী?'

'ডস্টয়েভস্কি? কখন?'

'ওই যে শচীনের বাড়িতে?'

'শচীনদা? আরে, ও-হ্যাঁ। শুনুন শুনুন বিল্বদা', বেতের চেয়ার-টেয়ার সমেত হুড়মুড় করে এগিয়ে এল পিনাকী, 'সেদিন বাড়িতে গেছি পত্রিকা দিতে। সল্টলেকে। বৌদি বললেন, বোসো পিনাকী। আসো না কেন আজকাল? বললেন, বেরুব। কোথায় বৌদি? তাজ-এ। ওই যে, বাংলাদেশের হাই কমিশনারের পার্টি? ফিরোজা বেগম আসছেন। যদিও নজরুলগীতি, বলে নাক কুঁচকোলেন। তোমায় নেমন্তন্ন করেনি? এই সব ন্যাকামি। গা জ্বলে যায় কিনা বলুন। আমাকে ডাকবে তাজে! বললেন, চা খাবে? জানো তো ওর দেরি হয়? আমি জানতাম, মেয়েদের দেরি হয়।

কিন্তু বৌদি তো রেডি। বৌদি তো রেডি। বৌদি হঠাৎ জানতে চাইলেন, গত শুক্রবারের লেট নাইট ফিল্মটা দেখলে? ফিল্মটা দেখলে? কোনটা বৌদি? ওই যে ডস্টয়েভস্কির জীবনের শেষ ক'দিন নিয়ে ফিল্মটা? অনেকে তো বলাবলি করছে— ওর সঙ্গে নাকি খুব মিল আছে। ধরণী দ্বিধা হও! ধরণী দ্বিধা হও!'

প্রবাল গলা নামিয়ে আমাকে বলল, 'লে, ওঠ। পিনাকীটা মাতাল হয়ে পড়েছে। এক কথা দু'বার করে বলছে। এখানে আসার আগে তিনটে খেয়ে এসেছিল।'

টের পেয়ে পিনাকী ওর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'তারপর শুনুন না প্রোআলদা। ডস্টয়েভস্কি বেরুলেন। গায়ে হাঁটু পর্যন্ত মটকার স্ট্রাইপ-দেওয়া পাঞ্জাবি। শ্‌শ্‌শ্‌-শাদা কুর্তা। পায়ে ক্রুকার্য করা ক্যাশ্মিরি নাগরা। সে কি দৃশ্য! চুলে কলপ। চুলে ক-লপ। পচা লাশ একটা যেন উঠে দাঁড়িয়েছে সেজেগুজে। সেজে-গুজে। উরেব্‌বাস। সে কী ভআবহ—' পিনাকীর মাথা টলে পড়ল চেয়ারে। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমরা ওকে তুলতে যাচ্ছি। শিবনাথ থালায় তিন পেগ হুইস্কি নিয়ে হাজির। কী ব্যাপার?

শচীনবাবু পেমেন্ট করে গেছেন। তা এত দেরিতে?

'বার ক্লোজ হওয়ার ঠিক আগে দিতে বলে গেছেন স্যার।' শিবনাথ সহাস্যে জানাল।

চার পেগ খেয়েছি। হিসেবে আরও দেড়। আমার চলতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাল ওর রসবোধ তথা বদান্যতায় মুগ্ধ!

দুঃখ হয় আমার, প্রবালের জন্যে। সে কিছু তলিয়ে দেখতে জানে না। আজ আমাদের সি আই টি বাজারের ফলওয়ালা যতীন চিৎকার করে (যদিও খুব কাছের একজনকেই) বলছিল (আমাদের তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে শোনা যাচ্ছিল), 'মাইরি, আগে বেস্পতিবার কতও ফল বিক্রি হত। আজকাল একদম হয় না। কেন বল তো?' অথচ, একটু চেষ্টা করলেই সে জানতে পারত, এখন বেস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো হয় না। সন্ধ্যায় শাঁখ বাজে না আর। এখন।

আমরা যখন লেখালেখি শুরু করি, সিনিয়র লেখকরা আমাদের একসঙ্গে দেখলেই বলত, 'এই যে, থ্রি মাস্কেটিয়ার্স!' মনে হত, আমাদের লক্ষ্য এক। আদর্শ এক।

বেলা যত বাড়ল, প্রভেদগুলো তত স্পষ্ট হতে লাগল। ক্রমে উল্কি হয়ে দেখা দিল সর্বাঙ্গে। তবু কেউ মুখোশ খুললাম না। বরং দিনে দিনে যেন জেল্লা বাড়তে লাগল তার। তারই জের আজকের এই প্রেস ক্লাব পর্যন্ত গড়িয়ে এল।

বন্ধু; কিন্তু আমরা কেউ আর বন্ধু নেই। কেউ কারুকে বিশ্বাস করি না।

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স আজও একসঙ্গে। শুধু দুমা মারা গেছে।

১১। আন্তর্জাতিক শস্যক্ষেত্র ও প্রহরী কাকতাড়ুয়া

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরদিন, আজ থেকে ৫৮ দিন আগে যেদিন নন্দনের সামনে দেখা হল। যদিও এক বছর পরে। আমি দেখলাম, রুবি ভিড়ে হেঁটে যাচ্ছে। রুবি তো? এর আগে বেশ ক'বার— কতবার আর কোথায়-কোথায় এখন আর মনে করতে পারি না— রুবি কিন্তু রুবি-নয় এমন মেয়েকে দেখে ধক করে উঠেছে বুক। কাছে চলে গিয়ে সরে এসেছি। নির্ভুল রুবি এই প্রথম, যাতে কল্পনার ছিটেফোঁটাও লেগে নেই। শ্রোণিভারে সেই অলসগমনা হাঁটা— একটার পর একটা পা ফেলে, প্রায় পা টিপে। হাতে সেই অদৃশ্য পোস্টার যাতে লেখা, 'আমার কোথাও যাওয়ার নেই, কাজেই আমি কেন হাঁটব?' পায়ে নরম চটি। চামড়ার জুতো সে কখনও পরে না। আজ হালকা বেগুনি সালোয়ার। সাদা কামিজ। কোমরে রুপোর সরু পাটি বেল্ট।

'কী ব্যাপার, পাত্তা নেই কেন' বা 'বিয়ে তো সবাই করে, কিন্তু পূর্বাশ্রম ভোলে তো শুধু সন্ন্যাসীরা'— এ-রকম হালকাভাবেই শুরু করার কথা ছিল, যদি ভিড়ে মিলিয়ে যাওয়ার আগে সে-সুযোগ আমাকে সে দেয়। 'তারপর? আছো কেমন বলো?' এ-রকম ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ করা যায়, আবার, 'বিয়ে করে কী-রকম আছো, বলো?'— এ-ভাবেও বলা যেতে পারে। শেষেরটিই বেশি ইন্টিমেট শোনাবে না কি? মেপেজুপে বলতে পারলে, মেয়েরা আন্তরিক কথা পছন্দ করে। মোটকথা, ওকে প্রথম মুভমেন্টেই বুঝিয়ে দিতে হবে, ও বিয়ে করেছে এতে আমি খুশি, এবং আমর্ম। আমি কিন্তু অ্যাসিড ছোঁড়ার কেস নয়। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি ওকে। এককথায়, একদম মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অকম্পিত সহাস্য অভ্যর্থনা করতে হবে।

কিন্তু, আজ এক বছর পরে যার সঙ্গে দেখা হল, সে অন্য এক রুবি। সে হাঁটা থামাল না। সে পালিয়ে গেল না। আমাকে পরমাশ্চর্য করে দিয়ে সে আমার হাত টেনে নিল হাতে! এবং মমতাময়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব নরম, পরম প্রীতিভরে জানতে চাইল, 'কী খবর তোমার? তুমি কেমন আছো?' (আমি ভাষা-চর্চা করি। মাত্র দুটি কথায় দু'দুবার 'তুমি' প্রয়োগ কতখানি আন্তরিকতা দাবি করে, সে আমি জানি।)

অথচ, কাণ্ড দেখ মেয়ের, চোখে-মুখে অনুশোচনার লেশমাত্র যদি থাকবে! যেন, একবছর দেখা করেনি, এতে কিছুই দোষ হয়নি।

নন্দন ছেড়ে আমরা পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগলাম। পিছনে পড়ে রইল ২৪ এপ্রিল। নন্দনে শায়িত সত্যজিৎ রায়ের মরদেহ। হাজার হাজার শোকার্ত নরনারী। রেসকোর্সের কাছাকাছি এসে, রুবি যখন বাঁদিকে ভবানীপুর রোড ধরল, বুঝলাম সে কোথায় নিয়ে যাবে।

ভবানীপুর রোড সেমেটারির দক্ষিণ দিকে ওয়র মেমরিয়ালের কালো কালো ফলকগুলি ছাড়িয়ে একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে আমরা বসি। আমাদের সামনে একটি কাঁচা কবর, এখনও স্তম্ভ তৈরি হয়নি। স্তূপাকার মাটি। তার ওপর পোঁতা গাছের ডালে আঁটা একটি পিসবোর্ড। তাতে সদ্যমৃতার নাম লেখা। রুথ স্টিফেন। বর্ন ১২ জুলাই ১৯৬৫। ডায়েড ১৮.৪.৯২। একদম রুবির সমান বয়সী।

সেই কখন হাত ধরেছে রুবি, একবারও ছাড়েনি। এতটা পথ আমরা এলাম হাত ধরাধরি করে, আমরা একটা কথাও বলিনি। গান যা পারে না, আমি অবাক হয়ে দেখি, রুবি তা পারে। শুধু হাত ধরে থেকে, আমার গত এক বছরের ধূলায়-ঢাকা সব দীনতা মলিনতা সে ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দেয়।

রুথ স্টিফেনের কবরের ধারে বসে সে প্রথম কথা বলে।

আমার আর-একখানা হাত বিপুল আবেগে টেনে নিয়ে রুবি বলল, 'তুমি কি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ?'

যেন একটা প্রবল চুম্বকক্ষেত্র তার ক্ষমতা প্রয়োগ করছে সহসা, আমার অস্তিত্ব ছিঁড়ে শত শত সুচ তার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে, আমি দেখলাম, আমার দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

'এই কাঁদে না, ছিঃ।' রুবিও ব্যাকুল গলায় বলল, 'আচ্ছা-আচ্ছা, স্বীকার করছি অন্যায় হয়েছে আমার।'

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আমি রুবির হাঁটু জড়িয়ে ধরি।

'ছাড়-ছাড়।' রুবি সরে বসল, 'ওই দ্যাখো, গেট দিয়ে কারা ফুল হাতে ঢুকছে। হয়ত রুথের আত্মীয়!'

নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদলাম আমি। কতদিন পরে কাঁদছি। ক্যালিফোর্নিয়ার ছোট্ট শহর মারিপোজায় আমার ছোটভাই পল্লবের ফিউনারাল পার্টিতে কিছু বলতে গিয়ে সেই শেষবার। সমবেত সাহেবদের সামনে কেঁদে ফেলতেই সেদিন লজ্জা করেনি! আজও কাঁদতে আমার লজ্জা করে না।

রুবি আমার ঘাড়ে-চুলে হাত বুলিয়ে দিতে চাইছিল।

'এ-রকম কোরো না। কেউ সহানুভূতি জানালে', ওর হাত সরিয়ে দিতে গিয়ে আবার আমি ফুঁপিয়ে উঠি, 'এ-সব বাড়ে। একটু সময় দাও। আমি নিজেই সামলে নিচ্ছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার ট্র্যাজেডি কোথায় জানো রুবি', কবরখানার সীমানা পাঁচিলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে একটু পরে আমি বলি, 'আমি ভেবেছিলাম, দেখা হলে হাসতে হাসতে কথা বলব তোমার সঙ্গে। কী আহাম্মক আমি! ও হো।'

'আবার কাঁদে।' রুবি এবার হাত ঝাঁকিয়ে বকুনি দেয় আমাকে, 'এই তো আমি এসেছি। তোমার পাশে বসে আছি।'

কান্নাও স্নান একরকমের। অনেক শুদ্ধ, শান্ত করে দেয়।

'আমি তোমাকে কোথায় ক্ষমা করতে পারব না জানো রুবি?'

রুবি চুপ।

'এই একটা বছর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা দূরে থাক, তার কোনও চেষ্টাও তুমি করোনি বলে। জীবনের সঙ্গে এ-রকম ব্রুটাল, রুথলেস আচরণ করতে পারে শুধু মৃত্যু। তুমি কে, আমাকে বলতে পার রুবি? সেই একটা ফোন নম্বর দিয়েছিলে। একবার পেয়েছিলাম। তারপর যতবার করেছি, প্লিজ চেক দা নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড। একদিন তো মনে হল তোমার নিজেরই গলা। কোথায় তোমার অফিস, তুমি কে, কোথা থেকে আসো— আমি তো কিছুই জানি না। কে তুমি?'

'এম-ম্যা।' রুবি নড়ে-চড়ে বসে। প্রায় উঠে পড়ার উপক্রম করে বলে, 'এ-সব কী বলছ তুমি!'

চেনা-অচেনার মুষ্ঠি চেপে ধরে তাকে বসাই। যদিও এখানে ভিড় নেই। রুবি আর আমি ছাড়া কেউ নেই। ভোজবিদ্যা প্রয়োগ করে এখানে বিশেষ সফল হবে না।

কিন্তু আবার ভুল করছি। আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এই সব আবেগ। আঃ, এরাই ডোবায়। আমাকে বরাবর ডুবিয়েছে তো এরাই। এখন দরকার বুদ্ধির। শুধু যা বাঁচাতে পারে। আগেকার সাজানো কথাগুলো আমি প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করি। সেইখান থেকে কথা বলার চেষ্টা করি, যেখানে আমাকে দুর্বল মনে হবে না।

ওই যে, একটা মনে পড়েও গেছে।

বাতাসের মত হালকা গলায় আমি হঠাৎ সুর পাল্টাই, 'কেন বিয়ে করা মানে কি সন্ন্যাস নেওয়া যে পূর্বাশ্রম একেবারে ভুলে যেতে হবে?'

'ভুলিনি তো।'

'সেটাই কী যথেষ্ট?' (ওহো, আবার ভুল।)

সহসা! এবং একেবারে অপ্রত্যাশিত। রুবি তীব্রস্বরে জানতে চাইল, 'তুমি কী আমাকে ব্যভিচারিণী হতে বলো?'

ঠিক ও-রকম ফ্রন্টাল বা সরাসরি নয়, কিন্তু এ-জাতীয় কথা উঠতে পারে এবং তার উত্তরে আমার যা ভাবা ছিল তা হল— না-না। ছিঃ। তুমি এখন বিবাহিত। ইউ কান্ট বি আনফেথফুল টু ইওর হাজব্যান্ড। সে কী অপরাধ করেছে। তুমি শুধু মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি কাঠি দিয়ে ছোঁব না তোমায়, কথা দিতে পারি। যদি বলো, জীবনে আর মাত্র দু'বার পারবে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে, আমি তাতেও রাজি। যদিও জানি, আরও একবার আসবে, আমার মৃত্যুর পর। কিন্তু সে তো আসা নয়।

এ-জাতীয়। যাতে আমাকে সৎ মনে হয় রুবির। মহৎ ও বিবেকবান মনে হয়। পুরুষ মানুষকে সৎ, মহৎ বা বিবেকবান হিসেবে দেখতে চায় না, এমন নারী জন্মাতে আজও বাকি।

আবেগ ও অনুভূতির তুলনায় বুদ্ধিকে যে এ-ভাবে প্রাধান্য দিয়ে যাই আমরা, সে কেন? কারণ, আমরা মনে করি, এতেই আমাদের লাভ। বুদ্ধিই তো কাছে এনে দেয় যা কিছু কাম্য— অন্যের তুলনায় বেশি রোজগার, খরচ ও সঞ্চয়— আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনের (বিবাহিত ও বিবাহোত্তর) অপ্রশমিত সুযোগ— এককথায় গাছের খাওয়া ও তলার কুড়নোর এই যে লবেজান ধর্মযুদ্ধ— একে জয় থেকে জয়ে নিয়ে যায় তো শুধু বুদ্ধি। নানা ভাষা, নানা পরিধানে পৃথিবীব্যাপী এই একটাই শোভাযাত্রা।

সে-তুলনায় আবেগ-টাবেগের মূল্য কতটুকু? এগুলো চিত্তচাঞ্চল্য ছাড়া কী। ক্রমাগত লক্ষ্যভ্রষ্ট করাই এদের কাজ। তাই নয় কী? বুদ্ধিমান মানুষের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শস্যখেতের চারিধারে আমরা তাই লাগাই বিচার ও বিবেচনার বেড়া। কালো, হাঁড়িমাথা সতর্ক এক কাকতাড়ুয়াকে ক্ষেত্রের প্রান্তে সংস্থাপন করি। যাতে আবেগ-অনুভব এরা ভয় পায়। ধারে-কাছে না ঘেঁষে। কিন্তু, রুবির সর্বস্বান্ত চ্যালেঞ্জ শুনে, তার সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ বুদ্ধিদীপ্ত যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিত পিছনে ফেলে আজ ওই প্রথম ওই শস্যখেতের দিকে, বন্য শুয়োরের মতো কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে, আমি নিজেকে সবেগে মাথা নিচু করে ছুটে যেতে দেখি।

তুমি কি। আমাকে। ব্যভিচারিণী। হতে বলো।

এ-ভাবে মন্ত্রোচ্চারণ করে যদি আগুনে ঘৃতাহুতি দেয় কেউ, আগুন কী করতে পারে। এক দাউদাউ জ্বলে ওঠা ছাড়া?

'ব্যভিচারিণী?' মটমট শব্দে বেড়া ভেঙে আমি এগিয়ে যাই, 'কেনই বা হবে না? পৃথিবীতে ব্যভিচারিণী নারী কি তুমি প্রথম হবে? (আন্না কারিনিনা হয়নি? মাদাম এম্মা বোভারি লুকিয়ে যেত না লিয়ঁর কাছে? 'আরে পুরুষ!' 'আরে পুরুষ!' বলে কপিলা খেপিয়ে তোলেনি পদ্মা নদীর মাঝিকে? তারা ময়নাদ্বীপে চলে যায়নি?)

কিন্তু যুক্তি-তর্ক— এরিউডিশান!'— এ-সবও মেয়েরা শোনে— কিন্তু বোঝে না। যা বোঝার তারা বোঝে শুধু ঝাঁপিয়ে পড়লে!

'শোনো রুবি।' আমি ওর বাঁ-হাতের কব্জি চেপে ধরি রুলিসুদ্ধ (যদিও আমার হাতের কাঁপুনি আমি থামাতে পারি না) 'এই সব ব্যভিচার-টার এগুলো সমাজের চিন্তা, রাষ্ট্রের চিন্তা। তাদের খেতের ধারে এরা সব এক-একটা কাকতাড়ুয়া। এদের ভয়ে মরে-মরে আমরা কি মেরে ফেলব নিজেদের? পরিণত হব এক-একটা জিরো-তে?'

হাত ছাড়াবার একটুও চেষ্টা না করে হিম, শান্ত স্বরে রুবি জানতে চাইল, 'কী বলতে চাও তুমি?'

আর এক-মুহূর্ত সুযোগ দিলে বুদ্ধিকে, আমি পারতাম না বলতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বলতে চাই', চোখ বুজে আমি দশতলা থেকে ঝাঁপ দিই (এক লাথিতে ভেঙে ফেলি কাকতাড়ুয়ার মুণ্ডু) 'আমি আর একবার তোমার সঙ্গে সঙ্গম করতে চাই। আমি কথা দিচ্ছি— এই শেষবার। আমি আর কখনও বলব না।'

রুবি হাত ছাড়িয়ে নিল। হাঁটুতে মুখ রেখে চুপ করে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর কথা বলল।

'তোমার যা বলার বলা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। যা বলতে চাই, আমি সবটা বলেছি।'

'কিন্তু', রুবি বলল, 'আমার একটা কিন্তু আছে।'

'বলো।'

'শুধু, মাত্র, আর-একবার কেন?'

'কারণ, এতদিন ছিল অন্য ব্যাপার।' আমি সোজাসুজি বলি, 'আর এবার একটা প্রতিবাদ। আর দরকার হবে না।'

'কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ?'

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে।'

'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে?'

'হ্যাঁ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ শুধু নয় রুবি, তুমি একে আমাদের বিদ্রোহও বলতে পারো', আমার মধ্যে শত শত বিদ্রোহীর শৃঙ্খল ভাঙার শব্দ খানখান হয়ে বাজতে থাকে, কাঁপতে কাঁপতে আমি বলে যাই, 'যারা আমাদের মিলন হতে দেয়নি— কেদার থেকে ফিরে আসার পর— চারমাস পেরিয়ে গেছে— প্লাজেন্টা ফর্ম করে গেছে— যারা তোমাকে আবোর্ট করাতে বাধ্য করেছে—'

'চুপ করো!'

'যারা বাধ্য করেছিল—'

'চুপ করো!!' রুবি আর্তনাদ করে ওঠে।

রুথ স্টিফেনের কবরের দিকে রুবি হাঁটুতে মুখ রেখে তাকিয়ে। বহুক্ষণ চুপ করে আছে। কবরের মাথায় একটা ছোট্ট ডালিম গাছ। ছোট ছোট হলুদ ঘণ্টার মতো ফুল। ফুলের ভারে কবরের ওপর নুয়ে পড়েছে গাছটা। বিকেল শেষ হয়ে এল।

ঝড় থেমে গেছে। যা বলতে চাই পুরোটা বলতে পেরে, জীবনে এই প্রথম আমার অসম্ভব চরিতার্থ লাগে।

ওদিকে, দূর গেটের কাছে সেমেটারি বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা বাজছে। ছ'টা বাজল। সত্যজিৎ রায়ের শবযাত্রা ছ'টার সময় শুরু হওয়ার কথা না? আমার এতক্ষণে খেয়াল হল।

সেদিন রুবির শেষ প্রশ্ন ছিল, 'অবিবাহিত মায়ের সন্তান জন্মাত কী করে?'

'যদি বিয়ে না থাকত', দু'ধারে লাল ইটের কেয়ারি, মাঝখানে সরু মোরামের পথ বেয়ে যেতে যেতে. অগণন ওবেলিস্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে ও রুবিকে দাঁড় করিয়ে উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'পাঁচ মাসে পড়ে আবোর্ট করাতে গিয়ে সন্তানধারণের ক্ষমতা তুমি চিরকালের জন্যে হারাতে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলট্রাসোনোগ্রাফের প্লেট তুমি নিজে দেখেছিলে। জোড়া বাচ্চা নিয়ে প্যারাম্বুলেটর ঠেলে আজ পার্কে বেড়াতে।'

শত শত মৃত মানুষকে সাক্ষী রেখে রুবি আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, 'তুমি কি অপেক্ষা করতে পারবে?'

শত শত মৃত মানুষকে সাক্ষী রেখে আমি কথা দিয়েছিলাম, 'হ্যাঁ।'

শত শত মৃত মানুষকে সাক্ষী রেখে আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'তুমি কি আসবে?'

শত শত মৃত মানুষকে সাক্ষী রেখে রুবি বলে গেছে, 'হ্যাঁ।'

শেষবার? হ্যাঁ, শেষবার।

তারপর আর আসবে না।

১২। রুবি কখন আসবে

সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমার সহপাঠী ছিল ব্রতীন সোম। সে শুধু একটা কথাই বলল আমাকে— 'চিনল না!' কে চিনল না, কাকে চিনল না, কেন চিনল না— সে বিষয়ে বলেনি কিছুই। বিয়ের পর (কতদিন পরে বলেনি), স্বামী-সহ পথে যেতে একদিন রাখির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। (পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর?) কোথায়, কখন, কী ভাবে, আমি জানি না। বলেনি কিছুই। শুধু বলল— 'চিনল না!' সে যে পাগল-টাগল হয়ে গিয়েছিল, তা না। তার বাকি সব আচরণ ছিল স্বাভাবিক। শুধু মাঝে মাঝে অমন বলত— 'চিনল না!' তবে ওই কথা দুটি শূন্যমনস্কভাবে উচ্চারণ করার সময় তার চোখের তারা যেত ঘুরে।

ব্রতীনের আত্মহত্যার খবর পেয়ে আমি তার মামার বাড়ি চণ্ডীপুরে গিয়েছিলাম। চণ্ডীপুর গ্রামটি মেদিনীপুরে। নরঘাট ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকে মাইলচারেক হেঁটে চণ্ডীপুর পৌঁছতে হয়। (গরুর গাড়িও যায়)। ওর দিদিমা আমাকে বললেন, 'কী বলব বাবা, হঠাৎ দেখলাম, আগুনের মধ্যে ভোম্বল। জ্বলন্ত দু'হাত বাড়িয়ে হেঁটে আসছে আমারই দিকে। ভয়ে, আমি এক বালতি জল ছুঁড়ে দিলাম ওর দিকে। লোকে তো বলছে— কম্বল চাপা দিলে হয়ত—'

'ওই এক কথা ছিল ছোড়দার' ওর মামাতো বোন পুষ্প আমাকে বলল, 'এমনিতে সব নর্মাল। শুধু মাঝে মাঝে বলে উঠত— 'চিনল না! কে চিনল না, কাকে চিনল না— আপনি জানেন কিছু, বিল্বদা?'

আমি আত্মহত্যা করিনি। পাগলও হইনি। কারণ, আমি জানি, রুবির সঙ্গে আমার দেখা হবে। সে আসবে।

বিয়ের ক'দিন পরেই কর্পোরেশনের সামনে দেখা হল। একদম মুখোমুখি। পালিয়ে গেল। চিনল না, বলি কী করে? চিনল বৈকি। মনে করল, খুনি। তা হোক। চিনেছিল। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে, বা, আমার ভাষায়, একবার নাড়া দিয়ে দেখলে, সে তো আশা রেখে গেছে সেদিনই। যে-ভাবেই চিনুক, সে আমাকে চিনেছে। আমার কেসটা সম্পূর্ণ আলাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ জানে না। শুধু আমি জানি। কাজ আমি একটাই করছি: অপেক্ষা।

এ-ক'দিন ধরে লেখালেখি যা করেছি, তা লেখা কিনা আমি জানি না।

না-হোক লেখা। আমি যে সাপের মতো খোলস ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে যাচ্ছি, এটা তো একটা ঘটনা? পাঠক এর থাক বা না থাক। আমার পাঠকের দরকার নেই।

নেই? একি রাগের কথা হল না? এমন বই কি হয় বা হয়েছে কখনও, বা, ছবি, যা পাঠকে পড়েনি বা দর্শকে দ্যাখেনি? হ্যাঁ, কিন্তু এ-ভাবে পঠিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে? আমাদের শ্রেষ্ঠ বইগুলি পরিণত হয়েছে এক-একটি বেশ্যায়। তারপর, যখন বিগতযৌবন, তারা এক-একটি বাড়িউলি মাসি তথা ক্ল্যাসিকে পরিণত হয়েছে— যেমন গোরা। হ্যাঁ, আজ একটা স্ট্যাটাস হয়েছে বটে তার।

এই তো, এই লেখাটা প্রথম অধ্যায় যখন শুরু করি (কৃশানু, বেঁচে আছো?)— কী ঝরঝরে আরম্ভ হয়েছিল। এক-একটা ছোট অংশ আর-একটার সঙ্গে মিলমিশ ও বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে কী চমৎকার একটা প্যাটার্ন তৈরি করছিল! তারপর প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা গেল চলে, তারপর অঙ্গ খসে পড়তে লাগল।

শচীনের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'শবযাত্রা' কী বিপুল প্রত্যাশাই না জাগিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কী হল। আমি গয়ারাম। সত্যি, প্রতিটি শিল্পীর কি ভয়াবহ অগোচরেই না অপদার্থতা পরিত্রাণহীন কুষ্ঠের মতো তাকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে অনুসরণ করে— কী অমোঘভাবে খসিয়ে দেয় প্রত্যঙ্গের পর প্রত্যঙ্গ!

সেবার হরিদ্বারে একদিন পরিচয় হল লোকনাথ কেশরীর সঙ্গে। সাধু নয়। কম্বল- ব্যবসায়ী। ঠাণ্ডা কুঁয়ার ধারে বসে কুলপি খেতে খেতে সে আমাকে জানাল, 'বাবুজি, সাফল্য আর ব্যর্থতা হল, মনে করুন, দুটো বন্ধ কৌটো। কিন্তু মজাটা কোথায় জানেন বাবুজি? সাফল্যের চাবিটা রয়েছে ব্যর্থতার কৌটোয়। আর ব্যর্থতার চাবিটা রয়েছে সাফল্যের জেবরে। ক্যা কুছ সমঝে আপ?' বলে সে সর্বজ্ঞের আবিল হাসি হেসে আমার দিকে হরিদ্বারের সিদ্ধির কুলপি এগিয়ে দেয়।

অপদার্থতার আক্রমণ থেকে লেখাকে বাঁচাবে কে? পাঠক, সমালোচক? হাঃ। প্রত্যেক শিল্পী তো নিজ-নিজেই বোঝে, যখন অঙ্গ খসে পড়ে। এখানে পাঠকের দরকার কোথায়? সমালোচক বা কী জন্যে?

এইজন্যে আমি চাই একটা বাস্তব ঘটনা, যা আমার লেখার মধ্যে ঢুকে যাবে। যাতে কল্পনার লেশমাত্র নেই। যা সাহিত্য নয়। যা এক অযৌন রোবো, যাকে কেউ ভোগ করতে পারবে না, কোনও পাঠক। যার একজনও দালাল লাগবে না, সমালোচক।

শুধু রুবি এসে সে অসম্ভবকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে। গতিদিব্যতা পাওয়ার জন্যে একজন ঘোড়সওয়ারের দরকার হাঁটুর চাপের মধ্যে দৌড়বাজ ঘোটকীর পেট। লেখার জন্যে আমার দরকার রুবিকে। সে এলে, সেই প্রকৃত ঘটনা টায়ে টায়ে ফুটে ওঠার দৃশ্যেই হবে আমার এ লেখার সমাপ্তি। পুজো সংখ্যা আসুক, পুজো সংখ্যা চলে যাক, রুবির জন্যে অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩। রুবির সঙ্গে হীরাবন্দরে

প্রথম অঙ্ক

'আসুন রাজা। আপনি এই বাদামি ঘোড়াটায় উঠুন। রানীমা, আপনার জন্যে কি একটা টাট্টু আনব?

'না-না।' তার রক্তিম পাঞ্জা ওদের দিকে রেখে রুবি হাত নাড়ায়, 'আমি ঘোড়াতেই যাব।'

আমি একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, 'গুরান না?'

'হ্যাঁ মহারাজ। বান্দার নাম গুরান।'

'অরণ্যদেবের...'

'ধ্যাৎ।' রুবি বলল, 'অরণ্যদেব এখানে আসছে কোত্থেকে। এ তো ডায়মন্ডহারবারের গুরান।'

ডায়মন্ডহারবারে আমি আগে কখনও আসিনি। রুবি বহুবার আসতে বলেছে আমাকে। 'চলো না একদিন। অনেকেই তো যায়। বাসনাদি তো রেগুলার যায় গুরুদেবকে নিয়ে। ওখানে হোটেলে রিলেশান জানতে চায় না, জানো?' গালের মধ্যে জিব বুলিয়ে, অপাঙ্গে দেখে নিয়ে আমাকে, 'একদম স্ট্রেট ইজ দা গেট।'

বেশ ক'বার দিনক্ষণ ঠিকও করেছে রুবি। কোনওবার মেয়ের পরীক্ষা, কখনও সাহিত্য-সভা কি ফিল্ম ফেস্টিভাল, কোনওদিন বড় শালীর বিয়ের পঁচিশ বছর পড়ে গেছে। একবার মেয়ে-বৌ নিয়ে হঠাৎ যেতে হল কালিম্পং, ঝুনুর বায়না। আর প্রবালের সঙ্গে মদ্যপানের গুরুত্ব কি আমার ওপর কফি হাউসের তরুণ লেখকদের দাবি যে ডায়মন্ডহারবারের চেয়ে বেশি, এ কথা তো সে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত বলে বরাবরই মেনে নিয়েছে।

'যাব তো। কিন্তু, সময় কোথায় বলো তো।'

'হ্যাঁ। সে তো ঠিকই। আচ্ছা, এখন তাহলে থাক। যখন সময় হবে তোমার বলবে, কেমন?'

কামিজের খুঁট ধরে পাকাতে পাকাতে, মাথা নিচু করে রুবি বলেছে।

আমাকে একবার ডায়মন্ডহারবার নিয়ে যাওয়া রুবির একটা অবসেসন, বলতে গেলে। থেকে থেকেই বলে। এমনকি, বারদুই স্বপ্নে দেখা দিয়েছে। ডেকেছে। অন্তত দু'বারের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। প্রথমবার, স্বপ্নের আকাশ যেমন থাকে, মেঘলা। তবে দিনেরবেলা। খুব উজ্জ্বল আর হাসিখুশি মুখে আমার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে এনে রুবি বলল, 'কী গো, তোমার সময় হল?'

'সময়? কীসের সময়?'

'ডায়মন্ডহারবারে যাওয়ার। যাবে?'

বলতে বলতে শ্যাম্পু-করা চুল দুলিয়ে মিলিয়ে গেল।

আর একবার এসেছিল। তখন রাত্রিবেলা। সেবার খুব ভয় পেয়েছিলাম। স্বপ্নে মনে হয়েছিল, কবর থেকে উঠে এসেছে। দূরাগত জোলো আর লোনা হাওয়া বইছে মৃদু। স্বপ্নে মনে হয়েছিল ডায়মন্ডহারবার থেকে আসছে। গা থেকে মাটি ঝরে পড়ছিল। চোখের পাতায়, চুলে, সর্বত্র গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি। ঝরে পড়ছিল। সেবারেও ওই একই প্রশ্নোত্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুম ভেঙে গেল। আর তখন তো দিন, রবিবারের বিকেল।

তবে শেষবারের ব্যর্থতার জন্য রুবি আন্তরিক সমবেদনা পেতে পারে। সত্যিই করুণা হয় তার জন্যে। রুবিও দুঃখ পেয়েছিল খুব। আহা, বেচারা সেই কোন ভোরবেলা থেকে এসপ্ল্যানেড বাস-গুমটিতে দাঁড়িয়ে আছে। বাসের পর বাস চলে গেল। ট্যাক্সি নিয়ে আমি যখন পৌঁছলাম, তখনও যাওয়া যায়। কিন্তু ফেরার বাস পাওয়া কঠিন। তাহলে শান্তাকে, ঝুনুকে, কী কৈফিয়ত দেব আমি?

সব শুনে রুবির মুখটা ছোট্ট হয়ে গেল। সে অবশ্য যথারীতি বলল, 'না না। তাহলে থাক। চলো নুন-শো-তে কোথাও যাই।'

কিন্তু এবার সে ঝামেলা নেই। নেই আর কোনও পিছুটান। শান্তাকে বলেই এসেছি আমি। আজ আমি রুবির সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার যাচ্ছি। এবং রাতে ফিরব না।

'রুবি? রুবি কে?'

শান্তা বোধহয় প্রথমে ভেবেছিল, ঠাট্টা করেছি। তা নইলে কেউ, এর পরেও, 'পুজোর লেখার কী হবে' জানতে চাইতে পারে? কিন্তু, মাত্র একটি সিগারেট শেষ হওয়ার আগে, আমি রুবির সঙ্গে আমার গত পাঁচ বছরের সম্পর্কের সবটা বলে উঠতে না পারলেও, বিশেষত অ্যাশট্রেতে যেভাবে অগ্নিমুণ্ড চেপে ধরি, তা দেখে সে বাকিটা বুঝতে পারে। এবার আমার বাকি লেখালেখির চাবি রয়েছে রুবির বাক্সে, আমি ওকে জানাই। সেই চাবিটা আমার চাই-ই চাই। আর, শুধু রুবি আমাকে তা দিতে পারে। ফিরে এসে আমি বাকিটা লিখব।

'ওঃ সেই মেয়েটা। বাসে যাকে দেখেছিলাম।' শান্তা বলল, 'কিন্তু, ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে।'

সত্যি, দুঃখ হয় শান্তার জন্যে। এই সব সরলা গৃহবধূ, এরা নিজেরা নিজের স্বামী সম্পর্কে কত কম জানে। ওর ফ্ল্যাট আমার নামে, টাকাকড়ি যা, সাদা বা কালো, সব আমি পাব— অতএব ও আমার। বাইরে যা ইচ্ছে করুক, রাতে ফিরে শোয় তো আমার পাশে! আমি ওর বিবাহিতা স্ত্রী। সতীন বলতে আমার যদি কেউ থাকে, তবে তা ইনকাম ট্যাক্স। কিন্তু, হায়, প্রকৃত প্রস্তাব ঠিক এর বিপরীত। অন্তত, শান্তার স্বামীর ক্ষেত্রে।

সন্ধ্যাবেলা। স্কুল থেকে ফিরে, একটু ঘুমিয়ে নিয়ে, শান্তা কাগজ পড়ছিল। (ঝুনু গেছে ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদে, সঞ্জয়ের সঙ্গে আড্ডা দিতে।)

সে দিকে তাকিয়ে আমি বুঝি, আদর্শ গৃহিণীর মুখোশ পরে এই ভদ্রমহিলা গত দশ বছর ধরে আমাকে ধ্বংসই করে আসছেন। আমার বিবাহ হয়েছে এঁর জিজ্ঞাসাহীন, স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসী, আত্মতৃপ্ত অহঙ্কারের সঙ্গে। এঁর কাজ একটাই। আমার অনুভূতি ও আবেগের জগৎকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আমাকে একটি শহিদ-বেদিতে পরিণত করা। এক কথায়, আমার বিবাহ হয়েছে আমার যাবজ্জীবন কারাবাসের সঙ্গে। আমার সাফারিং-এর সঙ্গে। আনন্দের খোঁজে, আমি তাই, জেল ভেঙে, রুবির সঙ্গে যাচ্ছি হীরাবন্দরে। এ আমার জন্মগত অধিকার। কিন্তু, এঁর বিবেচনায় তা অ্যাডালটরি। হাঃ।

আমার ডায়মন্ডহারবার-ঘোষণা শুনে শান্তা কাগজটা ভাঁজ করতে লাগল। এক ভাঁজ, দু'ভাঁজ... দেখতে বই-এর মতো ছোট্ট করে ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, 'ডায়-মন্ড-হার-বার?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তাতে কী।'

'যাচ্ছ যাও।' সজোরে আরও একটা ভাঁজ দিতে দিতে শান্তা বলল, 'কিন্তু, ওখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।'

ডায়মন্ডহারবার সম্পর্কে আমি নিজে জানি না কিছুই। শুধু জানি, জায়গাটি সমুদ্র-মোহানা থেকে বেশি দূরে নয়। শুনেছি, গভীর রাতে ওখানে যে-কোনও বাসগৃহের ছাদে দাঁড়ালে, দূর থেকে সমুদ্র-গর্জন শোনা যায়।

অরণ্যবাসী গুরান না হলেও, অরণ্যদেবের বইতে লোকটা নিশ্চিত গুরানের ছবি দেখেছে। গুরানের থলথলে বিপন্ন বামনত্বকে নিখুঁতভাবে নকল করে নিজেকে সে এই ডায়মন্ডহারবারের দ্বিতীয় গুরান সাজিয়েছে। মাথায় হোগলা পাতার গোল টুপি, মায় কানের মস্ত মাকড়িটাও বাদ নেই। সন্দেহ নেই যে, জন্মগত অবয়ব এ-কাজে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। শুধু তার মুখ একটু বেশি ফোলা-ফোলা... বাঁহাতের তালুতে নোংরা- কাপড়ের পট্টি। এমনকি, নিজের নামও সে রেখেছে গুরান— কী উদ্দেশ্যে?

স্টিরাপে পা রেখে একলাফে রুবি একটা প্লমাণ সাইজের ধবধবে সাদা ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়ে। প্রবল হ্রেষাধ্বনি করে ঘোড়াটি সামনের পা-দুটি তুলে ধরে, নাকি, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে সটান উঠে দাঁড়ায়, সেই মুহূর্তে বোঝা দায়। 'উররররর-হেই...উররররর-হেই...' অশ্রুতপূর্ব ধ্বনি ধীর ও অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করে লাগাম টেনে রুবি তাকে শান্ত করে। কী মনোমুগ্ধকারী অবলীলায়।

'রানীমা এখনও ঘোড়ায় চড়া ভোলেননি দেখছি। মহারাজা?' আমার দিকে আভূমি বিনতি করে গুরান বলল, 'আপনারও ঘোড়ায় চড়া আসে নিশ্চয়ই?'

গুরান একা আসেনি সঙ্গে এনেছে একটি বাজনদার দল। তাদের পোশাক নোংরা ও শতচ্ছিন্ন, সকলেরই মুখ ফোলা-ফোলা, দু-একজনের এমনকি পায়েও কাপড়ের ব্যান্ডেজ। রুবির অশ্বারোহণকে স্বাগত জানাতে, তাদের হাতের ব্রাস, ম্যারাকাস, বঙ্গো ও কেটলড্রাম— এমনকি একটি ভাওলায়— পপসঙ্গীতের একটি বিট বেজে ওঠে এবং শুধু সেটাই বেজে যেতে থাকে।

ঝিনঝিন ঝিকিঝিকি
ঝিনঝিন ঝিকিঝিকি
ঝিকিঝিকি ঝিনঝিন
ঝিকিঝিকি ঝিনঝিন...

'মহারাজা?'

আমার ঠিক অভ্যাস নেই জেনে, যেন অপরাধ তারই, গুরান বলল, 'তাতে কী। তাতে কী হুজুর। আপনি উঠুন। কোনও ভয় নেই আপনার। এ খুব ভাল ঘোড়া। দেখবেন, চেঁচাবে না। পা তুলবে না। খুব লক্ষ্মী। এর নাম রেবেকা।'

'রেবেকা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রেবেকা সোরেন মালিক। এরা সাঁওতাল।'

রেবেকা? সোরেন? নামটা শুনেছি কি আগে। আমার মনে পড়ল না।

দুধসাদা ঘোড়ার পিঠে রুবি চলেছে আগে আগে। তার সঙ্গে চলেছে বাজনদার দল। বাজনা বেজে চলেছে। রুবির পরনে ময়লা এবং চিটচিটে, লাল-পাড় শাটিনের সাদা শালোয়ার। কালো কামিজ। তার ওপর জরিদার নেভি-নীল ব্রোকেডের ওয়েস্ট কোট। ছেঁড়া-খোঁড়া। কাঁধের কাছে কামিজটাও অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। তা যাক। ধবধবে কাঁধে ব্রেসিয়ারের কালো স্ট্র্যাপ দেখা যায়। কিন্তু সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এগিয়ে চলেছে দুলকি চালে।

না, যত ছিন্নবস্ত্রই হোক এরা, যতই নোংরা আর ক্ষুধিত দেখাক, এদের ঘোড়াগুলো কিন্তু রাজকীয়। অসম্ভব মাজাঘষা আর ঘোড়ার যা হওয়া উচিত তাই, তেজী। রুখু, তৈলহীন চুল রুবির মাথায় ডাই করে বাঁধা। তবে তার সটান বসে থাকার দৃপ্ত ভঙ্গিমায় একটা রানী-রানী ভাব আছে বটে। রুবি এগিয়ে চলেছে দুলকি চালে।

আমার ঘোড়ার রঙ হালকা বাদামি। আমার পাশে গুরান হেঁটে চলেছে দড়ি হাতে।

'আমাদের রাজা-রানী বলে তোমরা চিনলে কী করে গুরান?'

'এ তো হুজুর দেখলেই চেনা যাবে।'

'কী রকম?'

'আপনাদের মাথার পিছনে হুজুর দু-দুটো রামধনু রঙের রিং। তাই দেখে চিনলাম।'

'রামধনু? এখনও দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, হুজুর। রাজার মাথায় ও তো সব সময়েই থাকবে।'

'শুধু তুমি দেখতে পাও?'

'হ্যাঁ হুজুর। শুধু গুরান দেখতে পায়। আমি মুখিয়া বটে মহারাজা।'

'তোমার চোখে গ্লকোমা হয়নি তো গুরান?'

'গোলকামা কী জিনিস মহারাজ। সে কি কোনও রামধনু?'

'না, কিছু না।'

আমি চেঁচিয়ে জানতে চাইলাম, 'হাই রুবি! কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

রক্তাভ পাঞ্জা তুলে রুবি বাজনা থামাল। চিৎকার করে বলল, 'সমুদ্রের ধারে। চলো না!'

আবার বাজনা বেজে উঠল।

একটা সরু পাহাড়ি পথ ধরে আমরা উঠছি। গভীর খাদ ডানদিকে। পথ পিচ্ছিল, গোড়ালি-সমান ঘোড়ার গু। অনেকটা গরুড় চটি থেকে কেদারে ওঠার মতো। উঠছি তো উঠছিই। গভীর খাদের মধ্যে দিয়ে বহে চলেছে দুধের নদী। মন্দাকিনী না হয়ে যায় না।

'রাস্তায় এত জল কেন গুরান?'

'জল? এটা তো বরফগলার টাইম। চারিদিকে বরফ গলছে হুজুর।'

'একটুও হাওয়া নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, হুজুর।'

'একটাও পাখি নেই।'

'না, হুজুর।'

'একটা কুকুর দেখলাম না রাস্তায়।'

'না, হুজুর।'

'কী না-না করছ?' ঘোড়ার পিঠ থেকে আমি একটা প্রচণ্ড ধমক দিই গুরানের ভেকধারী জাল গুরানকে, 'একজোড়া কুকুর-কুকুরি থাকবে না রাস্তায়? এটা ভাদ্র মাস। ওদের মেটিং সিজন, তা জানো?'

ধমক খেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল গুরান।

তারপর গোস্তাকির জন্যে মাফ চেয়ে আবার জানাল, 'না, হুজুর। কুকুর এখানে নেই।'

'একটা গাছপালাও কি থাকতে নেই?'

গাছ? গুরান 'না' বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় উৎসাহে লাফিয়ে উঠল সে, 'হাঁ হাঁ, গাছ আছে। গাছ আছে! মানে, ছিল হুজুর।'

'গাছ আছে মানে ছিল? ঢপবাজির আর জায়গা পাওনি তুমি? চালাকি!'

'না-না। রাগ করবেন না রাজা।' দড়ির টান দিয়ে গুরান ঘোড়া থামায়, 'এই দেখুন, আমার এই লাঠিটা।' অরণ্যদেব-সহচরের হাত-লাঠিটাও দেখলাম পুরোপুরি নকল করেছে সে, 'একদিন এটাই তো ছিল একটা মস্ত গাছ। সে অবশ্য অনেক-অনেক অনেকদিন আগের কথা। এই গাছটা কথা বলতে পারত, এমন মিথ্যে কথা আপনাকে আমি বলব না হুজুর। তবে এ রাত্রিবেলায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোত।'

'বলো কী।'

'তবে আমি শুনিনি। আমি শুনিনি। কেন মিথ্যে কথা আপনাকে বলব হুজুর। আমার ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-'

'ব্যস, ব্যস।' আমি আবার ওকে ধমক দিই।

থতমত খেয়ে সে একদম বোবা হয়ে যায়।

'না-না। কী বলছিলে বলো।'

'বলছিলাম যে', অরণ্যদেব-সহচরের প্রকাণ্ড গলঅস্থি নাড়িয়ে ঢোক গিলে ডায়মন্ডহারবারের গুরান বলল, 'ওঁরা শুনেছেন। আমাদের তো লেখা থাকে না মালিক। পূর্বপুরুষদের কথা আমাদের সব মনে রাখতে হয়। ভুলে গেলে চলবে আমাদের— বলুন আপনি?'

গিরিপথ থেকে নেমে দিকচিহ্নহীন মৃত উপত্যকা এক। মানুষ দুরস্থান, মনে হল ওখানে কোনও কীটপতঙ্গ থাকে না।

শুনলাম, এটা পেরলেই সমুদ্র।

তা, এই প্রথম একটা জোলো হাওয়া বইছে বটে। আর তাতে সমুদ্রের নুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণে ঘোড়া বেশ সড়গড় হয়েছে আমার। রেবেকা সত্যিই লক্ষ্মী মেয়ে। গিভার টাইপের। গুরানকে বললাম, দড়ি ছেড়ে দিতে।

'হুজুর?'

'দড়ি ছেড়ে দাও গুরান।'

আমার দেরি দেখে রুবি অপেক্ষা করছিল পাহাড়ের পাদদেশে।

রুবিকে বললাম, 'তোমার সঙ্গে, সমুদ্র অব্দি, চলো ছুটে যাই?'

চোখ ছানাবড়া করে রুবি বলল, 'ঘোড়ার পিঠে?'

'ঘোড়ার পিঠে।'

'ছোটাতে পারবে?'

'পারব।'

বিপুল উৎসাহে স্টিরাপে লাথি মারল রুবি। বলল, 'চলো, চলো।'

'কিন্তু তার আগে' আমি বললাম, 'এসো তোমার চুলগুলো খুলে দিই। ওগুলো মাথার ওপর অমন ডাঁই করে রেখেছ কেন?' (ওর ব্লান্ট কাটের কথা আমার মনেও থাকে না।)

সাদা ও বাদামি আমাদের ঘোড়া দুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তারা পা ঠোকে। বুঝেছে, তারা এবার ছুটবে। তাদের ঘোড়া-জন্ম সার্থক হবে।

ঘোড়ার ওপর থেকে রুবি সাগ্রহে মাথা এগিয়ে দেয়। তীরে ওঠার আগে যেন হাঁস। তেমনি লম্বা গলা।

লাল রিবনের ফাঁস খুলে দিতেই চুলের তোড় ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর প্রশস্ত পিঠের ওপর। প্রথম দুলতে লাগল মৃদু মৃদু। কতদিন পরে পুনর্মিলন এই মন্দমধুর হাওয়ার সঙ্গে!

তারপর জোর হাওয়া উঠল।

'গিয়াপ!' স্টিরাপের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে রুবি মাথার ওপর লাগাম ঘোরায়।

'এসো, এসো আমার সঙ্গে। সমুদ্রের ধারে পৌঁছবার আগে আর থামা নেই।'

আমরা পাশাপাশি ছুটে চলেছি। আমাদের গতি দুর্বার কিন্তু ছোটার ছন্দে কী আশ্চর্য মিল। কেউ কারও থেকে একটুও এগিয়ে যাচ্ছি না। আর এই রেবেকা সোরেন (ঘাটশিলার রেবেকা সোরেনের কথা আমার একবারও মনে পড়ল না), রতিপটিয়সী রুবির সঙ্গে এর কত গভীরে মিল, ছুটে যেতে যেতে আমি তা ক্ষণে ক্ষণে বুঝতে পারছি। ইঙ্গিতমাত্র বুঝতে পারছে আমি কী চাই। (রুবিকে তো কখনও বলতে হয়নি, 'জামাকাপড় খুলে ফ্যালো রুবি', একবারটি কাঁধে হাত রাখাই যথেষ্ট হয়েছে।) ঢেউ-এর মতো উঠে আর পড়ে, মাঝখানে যখন গতিক্ষিপ্রতার চরম-রেখা ধরে ছুটে চলেছে, লাগামে মাত্র একটি টুসকির ইঙ্গিত দিয়ে জানালাম, 'অত দ্রুত নয় রেবেকা সোরেন। অত জোরে নয়। একটু ধীরে— না হলে আমি পড়ে যাব। আমি আরও কিছুক্ষণ তোমার পিঠে থাকতে চাই। আরও কিছুক্ষণ সক্রিয় রাখতে চাই তোমাকে'— কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুন্দর বুঝতে পারল। মন্থর করে আনল তার গতি। (বস্তুত, এ-খেলাতে তো এর স্বার্থ ওর কৌটোয়।)

রুবি এগিয়ে গেছে অনেকটা। দণ্ডে-বাঁধা কালো পতাকার মতো তার চুল উড়ছে পতপত করে। তাকে ঘিরে হরিদ্রাভ অশ্বধূলি।

গুরান ও তার যন্ত্রীবৃন্দ আমাদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এখন তাদের পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো দেখায়। তবু বোঝা যায় তারা হইহই করেই ছুটে আসছে।

মাথার ওপর ঘোলাটে আকাশ। এ-আকাশ কি নীল ছিল কোনওদিন? অন্তত তার পূর্ব-পুরুষদের আমলে?

গুরান বলতে পারবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

আমাদের হোটেলটি একটি বালিয়াড়ির পাদদেশে। সমুদ্র মাইল তিনেক দূরে। সমুদ্রের গর্জন এখান থেকে একটুও শোনা যায় না। যদিও একটা জোলো আর লোনা হাওয়া মাঝে মাঝে এখানে এসে পৌঁছয় ও তার দূরে-কোথাও অস্তিত্বের জানান দেয়। ওখানে আকাশ নীল। এতদূর থেকে আকাশ আর সমুদ্রের কোনও সীমারেখা বোঝা যায় না। একে অপরের অংশ বলে মনে হয়। বিশেষত, আমরা যখন পৌঁছলাম, তখনও সূর্য অস্ত যায়নি, অথচ, যেতে যেতে দিগন্তে একটি আস্ত চাঁদ দেখা দিল। কার আলো যে কার সঙ্গে মিশে, কে কাকে কতটা দিয়ে এবং কার কাছে কে কতটা নিয়ে রচনা করছে এ স্বর্গরঙ, তা অনির্ণেয় হলেও, এক অলৌকিক বিস্ময়ের সৃষ্টি হচ্ছে বটে। কতকাল পরে দেখা প্রেমিক ও প্রেমিকার, তাদের বোধ ও তাদের অবোধের! হিসেব ভুলে, তারা তো এ-ভাবে মিশেমিলে যাবেই। দিনের আলো আর রাত-আঁধারের চাবিও কি থাকে পরস্পরের কৌটোয়? পথে যেতে, গুরান আমাকে কথাপ্রসঙ্গে জানাল, জীবন আর মৃত্যু দুটো কৌটো মালিক। জীবনের চাবি মৃত্যুর এবং মৃত্যুর চাবি জীবনের কৌটোর মধ্যে থেকে গেছে। ('এ-কথা আমাদের পূর্বপুরুষরা বলে গেছেন হুজুর।')

একতলা তিন কামরার ছোটখাটো বাড়ি। ছাদ শনের। মাটির দেওয়াল। আলকাতরা-মাখানো কালো করোগেটেড টিনের ওপর সবুজ রঙ দিয়ে লেখা— হোটেল অপ্সরা। হোটেলের সামনে বেশ খানিকটা হাঁদা জমি। বেড়া দিয়ে ঘেরা। একদিন বাগান ছিল।

চটের নিচু সিলিং থেকে ঝুলছে ব্লেড-গার্ডারহীন একটা ওল্টানো টেবিল-ফ্যান। কিন্তু লোডশেডিং। অপ্সরা না ভিখারিনি? একটা দশ-বাই-দশ ঘর। তক্তপোশের সিঙ্গল বেডে হাটে-কেনা সবুজ সস্তা বেডকাভার। (চেক-ইন-করাবার আগে পাল্টে দেওয়াই রীতিসম্মত; নয় কি?) টিনের চ্যাপ্টা তোবড়ানো অ্যাশট্রে। বাথরুম নেই। তার বদলে অ্যাটাচড্ নর্দমার ধারে এক বালতি জল ও মগ। এক টুকরো ব্যবহৃত সাবান। কাতা দড়ি থেকে একটা বিচ্ছিরি গামছা ঝুলছে। টেবিলের ওপর একটা বন্ধ ঘড়ি। তাতে ৯টা বেজে ১৫। রাত না দিন জানার উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখেশুনে রুবি বলল, 'বাঃ। এমন কি খারাপ?'

সরু সিঙ্গল বেড দেখিয়ে আমি বললাম, 'একজনকে নিচে শুতে হবে।'

'তুমি শোবে!'

আমি বললাম, 'বেশ তো।'

'ঠিক আছে বেয়ারা ডেকে একটা মাদুর আনিয়ে নিচ্ছি। বেলটা বাজাও তো।'

বেল? ওম্মা, ঘড়ির পাশে একটা ঘণ্টিও রয়েছে।

'না-না, মেঝেয় নয়। মেঝেয় নয়।' রুবির পিছনে দাঁড়িয়ে ওর ভিজে বাহুসন্ধি থেকে সরু বালিকা-কোমর পেরিয়ে মেয়েমানুষের নিতম্ব পর্যন্ত হাত নামিয়ে আনতে আনতে আমি বলি, 'আমি বিছানার কথা বলছিলাম। যা সরু, একজনকে তো নিচে শুতেই হবে। আর সেটা আমি হলে আপত্তি নেই।'

'ধ্যাৎ!' রুবি বলল, 'এই না, ওখানে নয়।'

রুবি কখনও ঘাড়ে চুমু খেতে দেয় না। সে তার ভিজে আধখোলা ঠোঁট আমার ঠোঁটের সামনে মেলে ধরে। (কিন্তু ঠোঁটে-চুমুকে আমি অগ্রাধিকার দিই না। বিশেষত ভিজে থাকলে। ঠোঁট ছাড়া অন্যত্র চুম্বনেই আমি নিজেকে অনেক বেশি খুঁজে পাই।)

চুমু না খেয়ে, আমি বরং তার কাঁধে হাত রাখি। রুবি বুঝতে পারে। মাথা নিচু করে সে হাত রাখে কামিজের বোতামে। তারপর, তা না করে, জানালার শার্শি বন্ধ করে দিয়ে আসে। একমাত্র জানালায় পর্দা নেই।

অন্ধকারে রুবি বিবস্ত্র হচ্ছে। এ নতুন কিছু নয়। আলোয় সে জামাকাপড় খোলেনি কখনও। তার এ উন্মোচন-রীতি আমি সমর্থন করি। নগ্নতা আলোর জন্যে। কিন্তু নগ্নতরতার জন্য প্রয়োজন অন্ধকার। তবে, আজ তার, নিঃসন্দেহে, একটু দেরি হচ্ছে। তা হোক। আমারও তাড়া নেই। আজ আমাদের শেষদিন। আজ শেষবার।

আমি উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। অধমাঙ্গ বিছানার কিনারে রেখে সে আমার মেরুদাঁড়ায় মুখ রাখে। যথারীতি তার গায়ে সুতোটি নেই। কোনও-কোনওদিন সে তার গোড়ালি থেকে শুধু রুপোর নূপুরগুলো খুলে আসে না। আমাকে দিয়ে খোলায়। আজ সে, বলা যেতে পারে, তার নূপুর-অবধি-নগ্ন।

'যাই বলো, মাছটা কিন্তু দারুণ করেছিল। কী বড় বড় পিস।'

এত বলে উম্ উম্ শব্দে সে চুমু খেতে খেতে আমার শিরদাঁড়া ধরে উঠে আসে।

ঘড়ং!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এইসময় বিকট শব্দ করে পাখা ঘুরতে শুরু করল। তার থেকে ঝুলন্ত ডুমটাও জ্বলে উঠল দপ্ করে।

টেবিল ঘড়িতে ৯টা ১৫। আমার প্রথমেই চোখে পড়ল।

'আরে! আরে! আরে!' আবিষ্কারের আনন্দে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রুবি, 'তোমার কোমরে এটা কী?'

'কোমরে কী তা আমি কী করে জানব?'

'নান্-না।' রুবির গলায় গানের সুর, 'এই প্যাচটা। এটা ছিল নাকি এখানে। কবে থেকে হয়েছে? আমারও একটা প্যাচ আছে। হুবহু। এইরকম। তুমি দ্যাখো' ঘাড়ের কেশর তুলে সে দেখায়, 'আমার ঘাড়ের কাছে। দ্যাখো তুমি ভাল করে। পাচ্ছ দেখতে?'

উঠে বসে আমি ভাল করে দেখলাম। সত্যিই, নোংরা লম্বাটে লালরঙের বিজবিজে প্যাচ খানিকটা তার ঘাড় জুড়ে। মাঝখানে দু-একটা সাদা ফুটকি। মৃতের পচা চামড়া যেন জীবিতের ত্বকে গ্র্যাফট করে দেওয়া হয়েছে। (গোখরোর বাচ্চা যেন, হাঁ করে স্তনবৃন্তের দিকে এগচ্ছে, ঘাটশিলার রেবেকা সোরেনের বুকের মাঝখানে উল্কির কথা আমার মনে পড়ে না।)

ও, তাহলে এই ব্যাপার। এইজন্যে কিছুতেই চুমু খেতে দেয়নি ঘাড়ে। বিউটি কমপ্লেক্স!

'ও। এইজন্যে বুঝি এখানে চুমু খেতে দাওনি কোনওদিন।' বলে আমি ওখানে জিভ লাগাই, 'তোমার যত সুড়সুড়ি বুঝি এইখানে?'

'ওখানে?' ঠোঁট উল্টে রুবি বলল, 'ওখানে আমার কোনও সেনসেসানই নেই।'

'তার মানে? এতদিন যে বলতে ওখানে সুড়সুড়ি লাগে, তাই?'

'ও এমনি বলতাম। আসলে তো, সাড় নেই বলেই রাজি হতাম না। কী লাভ!' আমার পিঠে একটা ছোট্ট করে কিল মারে রুবি। বলে, 'কীঈ, সুড়সুড়ি লাগছে।'

'সুড়সুড়ি? কোথায়?'

'কেন, তোমার কোমরে?' সারা শরীর দুলিয়ে বিলোল কটাক্ষ করে রুবি বলল, 'দেশলাই কাঠি বোলাচ্ছি, সুড়সুড়ি লাগবে না? লাগবারই তো কথা। এখানেও তো অমনি একটা প্যাচ। লাল, বিজবিজে। যদিও এখন এইটুকুন। একটা আধুলির মতো ছোট্ট।'

এখন?!

আমার বরফের পা থেকে ভয় বাষ্প হয়ে উঠে আসে।

রুবি বলে চলে, 'আচ্ছা, তোমার কি ওটা জন্ম থেকে? আমার যখন ২০/২১, হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করি। তখন তোমার মতো এই এইটুকুন ছিল। কাগজে তখন লুথেরান মিশন থেকে রোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজ্ঞাপন দিচ্ছে— জন্মগত কুষ্ঠ অত্যন্ত খারাপ। দেখাতে বলছে। আমি মার কাছে জানতে চাইলাম, 'মা, একি আমার জন্মগত?' মা বলল, 'জানি না।' গোড়ার দিকে দু-একবার চুলের কাঁটার খোঁচা দিয়ে দেখেছিলাম। দেখলাম, সাড়ই নেই। তারপর আর দেখিনি। তখন, বললাম তো, এইটুকু। বেশ চুপচাপ ছিল অনেক বছর। বুঝলে। হঠাৎ বাড়ছে হু-হু করে। কতটা বেড়েছে গো।'

আমি সাড়া দিই না।

রুবি বলে যায়—

'লুথেরানের বুকলেটে পড়েছিলাম প্রলঙ্গড অ্যান্ড পারপিচুয়াল মেমব্রেন কনট্যাক্ট থেকে এ-জিনিস হতে পারে। আচ্ছা, নিপ্‌ল কি মেমব্রেন। আমার জন্ম কোথায় জানো তুমি? বাঁকুড়ায়, মামার বাড়িতে। জন্মাবার পরেই মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেল। তা, মা কি করবে বলো? আর তখন বেবিফুড কলকাতাতেই পাওয়া যায় না। একটা সাঁওতাল বৌকে রাখা হল। তার বুকে খুব দুধ। ব্রেস্ট মিল্ক খেয়ে খেয়ে এই মোটা আর গোলগাল হয়েছিলাম, জানো। ছবি আছে। আমি দেখাব তোমায়। পরে জানা গেল, তার কুষ্ঠ আছে। আচ্ছা, নিপ্‌ল কি মেমব্রেন? যাই বলো, আমার থেকেই হয়েছে তোমার। তা তুমিও আমাকে কম চোষোনি বাপু। ওখানে।' বলতে বলতে আমাকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরল রুবি, 'কী ব্যাপার, রেডি? আজ এত তাড়াতাড়ি!'

গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়ার পর সব শহিদের যা হয়, আমার জননাঙ্গ অনেকক্ষণ থেকে দৃঢ় হয়ে আছে।

'শোনো রুবি', আমি ওর দু'কাঁধে হাত রাখি, (দুই কাঁধে হাত রাখার পর দ্বারধারিণী রেবেকা সোরেনের 'ভালা করল্যেক বাব্‌বু' আমার মনে পড়ে না,) 'কাল কলকাতায় ফিরেই আমরা ডাক্তার দেখাব। ডাঃ সলিল পাঁজার নাম শুনেছ?'

'হুঁ-উ-উ।'

'আমি তাঁকে চিনি। তাঁর কাছে যাব। কুষ্ঠ দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। রোজ বলে টিভিতে। দ্যাখোনি তুমি?'

'না-আ-আ!' আবার সেই গানের সুর, সর্বাঙ্গে দুলুনি, ডান গালে জিবের ঘোরাঘুরি এবং চোখে তারা-ভরা কটাক্ষ, 'তার আগে একটা 'সব' থাকে স্যার। আমি তো দেখিয়েছি ডাঃ পাঁজাকে। এই টাইপটার নাম লেপ্রমেটাস। বললেন, এটা সারে না।...

'এর কোনও চিকিৎসা নেই। প্রথমে চেঞ্জ অফ কালার। তারপর লস অফ সেনসেসান। তারপর লস অফ ফাংশান। তারপর লস অফ লিম্ব। গলিত কুষ্ঠ আর কী! আমার এখন থার্ড স্টেজ চলছে। তোমার ফার্স্ট' বলে সে আমার গালে ছোট্ট করে একটা আদুরে চড় মারে।

আজ পূর্ণিমা। আমার দিগন্ত জুড়ে এখন আর-একটা চাঁদ উঠছে। ছড়িয়ে পড়ছে তার আলো। আবছা হলেও, সম্পূর্ণ অন্ধকারের চেয়ে এ ভাল। আগের তুলনায় এখন অনেক কিছুই ফুটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠছে, যদিও কিছুই স্পষ্ট নয়। যেমন, আমি ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি; রুবির মা, মামা, বাঁকুড়া, সাঁওতাল রমণীর বুকের দুধ, তার অফিস, টেলিফোন নাম্বার— সব ব্লাফ। সমস্ত বানানো গল্প।

'রুবি, তোমার স্বামীকে দেখতে কেমন?'

'স্বামী? কার স্বামী?'

'কেন, তোমার?'

বুকে আঙুল রেখে রুবি বলল, 'আম্মার?' তারপর হাসতে লাগল কুলকুল করে, 'আ-আমার আবার স্বামী কোথায়?'

'বাঃ। তোমার তো বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কে বলল', দারুণ অভিমানে ঠোঁটটোট ফুলিয়ে একসা করে রুবি বলল, 'কেউ কি তাকে দেখেছে?'

'মেট্রো রেলে শুচিস্মিতা তোমার শাঁখা-সিঁদুর দেখেছে।'

'ওঃ।' ফের সে ঠোঁট ওল্টায়, 'সে তো সেই একদিন। একদিন শখ করে পরতে নেই বুঝি?'

'সেমেটারিতে যে বললে—'

'বললাম!' রুবি বলল, 'দেখলাম, কত ধানে কত চাল। কতটা ভালবাস তুমি আমায়। কতটা জেলাস হও।' বলল এমন ভাবে যেন পরিতৃপ্ত আহারের পর ভাজামৌরি ফেলছে মুখে।

'কর্পোরেশনের সামনে আমাকে দেখে পালিয়ে গেলে কেন?'

'এই শোনো!' হঠাৎ হাস্কি হয়ে গেল তার গলা। খুব ভীতভাবে রুবি বলল, 'সেই প্রথম দেখলাম, তোমার কুষ্ঠ হয়েছে। যদিও তখন ফার্স্ট স্টেজও নয়। ক্লিনিক্যালি তখনও পাওয়া যাবে না কিছুই। কিন্তু, আমি বুঝলাম', আমার হাত চেপে ধরে রুবি যার-পর-নেই আন্তরিকভাবে বলল, 'বিশ্বাস করো, এত কষ্ট হল তোমার জন্যে। এমন অপরাধী লাগল। মনে হল, আহা, আমার জন্যেই তো হয়েছে।'

আমার ব্যক্তিগত নিসর্গ জুড়ে প্রখর থেকে প্রখরতর হচ্ছে চাঁদের আলো।

'রুবি।' প্রসঙ্গ পাল্টে আমি জানতে চাই, 'এই যে এতটা পথ এলাম আমরা। একসঙ্গে। গুরানদের কারও কই ছায়া পড়ল না তো।'

'পড়বে কী করে।' রুবি চটপট উত্তর দেয়, 'সূর্য কি ছিল আকাশে। আর থাকলেই বা কী। ছায়া তো আমারও পড়ে না। দ্যাখোনি তুমি?'

'সে কী!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আ-হ্যাঁ।' আবার সে নিজেই নিজেকে দোল দেয়, 'যদিও মেঘের দিনেই আমি বেছে-বেছে এসেছি। তবে সূর্যে এলেই বা কী? আমাকে কি ভাল করে দেখেছ তুমি কোনওদিন? বলো দেখি, কেমন দেখতে আমাকে?'

সে আমার চোখে দু'হাত চাপা দেয়।

রুবি বলে যায়—

'সেই সে একটা গল্পে ছিল না, 'মণিমালার পাসপোর্টের ফর্ম ভর্তি করতে গিয়ে বার্থমার্কের আইটেমে এসে বিজনকে থামতে হল। বার্থমার্কের খোঁজে এই প্রথম সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়— 'তোমারই তো গল্প, ভুলে গেছ? (এ গল্পের কথা রুবি জানল কী করে। গল্প আমার ঠিকই। কিন্তু এ তো আমি এখনও লিখিনি। বলিনি কারুকে!) অবশ্য গল্প গল্পই। তোমার নিজের কেস এক্কেবারে আলাদা। সে তো পৃথিবীর একনম্বর স্ট্রেনের গল্প। তাই না? আচ্ছা, কত... কত সময় আমি তোমায় দিয়েছি বলো তো। কতদিন বলেছি এখানে আসতে! আজ পারব না ভাই— আজ স্পিলবার্গ। কাল পারছি না ভাই— কাল কালিম্পং। আজ প্রবালের সঙ্গে মদ। কাল ঝুনুর পরীক্ষা। কোনওদিন জোর করেছি তোমায়। এত ভালবাসলাম তোমাকে কেন তাই ভাবি', আমার মুখের ওপর মুখ রেখে রুবি বলল, 'যে কোনওদিন জোর করে কিছু চাইতে পারলাম না। তোমার কাছে।'

তার চোখ থেকে আমার চোখের মধ্যে টপটপ করে জল ঝরে পড়ে যখন সে সগর্বে বলে ওঠে, 'কিন্তু আজ তুমি স্বেচ্ছায় এসেছ!'

রুবি বলেই চলেছে। কী বলছে সে আর জানে না। কেউ তার কথা শুনছে কিনা, তা জানার আগ্রহ তার আর নেই। বোবায় ধরে মানুষকে। তাকে আজ প্রগলভতায় ধরেছে।

'রুবি, আমরা কি কুষ্ঠরোগীদের দেশে এসেছি?'

'চুপ!' সে ঠোঁটে তর্জনী রাখে, 'ওই দ্যাখো।' তার তর্জনী সঙ্কেতে আমি এই ঘরের অদ্বিতীয় জানালার দিকে তাকাই। দেখি, শার্শির কাচ দ্রুত বরফে ভরে যাচ্ছে। তবু, একটা তারা এখনও দেখা যায়।

'জানালা খুলে দ্যাখো' মন্দিরের পিছনে কেদার পাহাড় দেখতে পাবে।' রুবি বলল, 'যা সেদিন দেখনি। চারদিকে বরফ গলছে। শুনতে পাচ্ছ তার ফিসফিস?'

আজ পূর্ণিমা। আজ জোয়ার আসবে। হোটেল অপ্সরার চারিদিক জলে থই থই করবে আজ।

রুবি কথা থামায়নি। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে সে বকে চলেছে। জল সারারাত থাকবে। ভোর হওয়ার আগেই সাধারণত ফিরে যায়— গুরান আশা দিয়ে গেছে। ('তবে, সমুদ্র তো একটাই মালিক। মানুষ নানারকম নাম দিয়েছে।' গুরান বলে গেছে, 'সে যে কবে কী করে, সে তার মর্জি মালিক।')

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ পূর্ণিমা।

আমরা কি কাল ফিরব? না বোধহয়। আমরা কি কোনওদিনই ফিরব আর? না বোধহয়।

আজ বান আসবে।

কেউ যা পায় না। আমরা খুঁজে পেয়েছি নিজের দেশ। আমরা ফিরে পেয়েছি নিজের রাজ্য। এখানেই একটু একটু করে আমরা পচে, গলে, খসে পড়ব। আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর সীমারেখা ক্রমে মুছে যাবে। জীবন ও মরণের চাবি ফিরে যাবে যে যার কৌটোয়।

আজ থই থই জল আমাদের ঘিরে রাখবে সারারাত।

কিন্তু রুবি বলে চলেছে সম্পূর্ণ অন্য কথা। কাল ভোরের আগেই আমরা সমুদ্রে যাব। আমরা সূর্যোদয় দেখব। দেখবে ভাল লাগবে। নতুন মানুষ মনে হবে।❐

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~